অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

মিত্রালয়

১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সঞ্জীব বসু

সুসময়েষু

মণি সেন

দুঃসময়েষু

দিব্য বসু

অসময়েষু

অগাস্ট, ১৯৬০ সাল

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো। জীবিত, মৃত, অথবা জীবন্মৃত কারো সঙ্গে এ বইয়ের কোন চরিত্রের যদি কোন রকম সাদৃশ্য থাকেও, সেটা শুধুই সাদৃশ্য। সাদৃশ্য মানে রিসেমব্লেন্স—ফটো নয়।

কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি ঃ

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

লাড়ুমামার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সেকেণ্ড-ক্লাস ট্রামে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছেন, চিৎকার করে আমায় ডাকলেন, আরে অমল নাকি?

ট্রামটা স্টপে থেমেছিল, আমিও দাঁড়ালাম।

লাড়ুমামা বললেন, আছ ক্যামন?

বললাম, ভালই তো।

ট্রামের রড্‌টা আরো জোরে চেপে ধরে লাড়ুমামা ঝুঁকে পড়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেন, তারপর গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করলেন, শুনলাম সঞ্জীব বলে একটু জড়াইয়া গ্যাছে গা?

ডানহাতে ট্রামের রড্ ধরে আধঝোলা লাড়ুমামা বাঁ-হাতের তর্জনী থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত বার বার বৃত্তাকারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘুরিয়ে জড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিলেন।

সঞ্জীবকে দেখেছি; একটা লাগসই জবাব যেন জিভের ডগায় জমাই থাকতো। যে যাই বলুক না কেন, একটা মানানসই উত্তর তৎক্ষণাৎ মজুত। আমি কোনদিনই পারতাম না।

আজও দেরি হয়ে গেল। মনে মনে কিছু একটা মকশো করে থাকবো, বলতে যাবো, দেখি, ট্রাম বহুদূর। দৃষ্টির নাগালে লাড়ুমামা ঝাপসা হয়ে এসেছেন। ঝুলে থাকা অনেকের মধ্যে কোনটি লাড়ুমামা—আর বোঝা মুস্কিল।

তবু একবার হাতটা নেড়ে দিলাম। লাড়ুমামা যদি তখনো তাকিয়ে থাকেন, কিছুই যে বলি নি—এটা তার কৈফিয়ৎ হোক।

এই লাড়ুমামা। ঢাকায় কত না দেখেছি, তাঁতের ধুতিতে ধূল-ঝাড়া কোঁচা ঝুলিয়ে লাড়ুমামা রিক্সায় বসে।

আমরা চিৎকার করে ডাকতাম, লাড়ুমামা কই যান?

—স্বামীর-বাগ।

লাড়ুমামার রিক্সা কিন্তু থামত না। লাড়ুমামা চিৎকার করে বলতেন, স্বামীর-বাগ, অথবা পুরানা পল্টন কিংবা হয়ত কায়েৎটুলি,

আর হাতের অস্থিরতায় বুঝিয়ে দিতেন দেরি করবার সময় নেই। আমরা তবু ডাকতাম।

এই হাতনাড়ার ভাষাটা সবাই সমান বুঝতাম না বলেই। এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল চিত্ত। হাতনাড়া দেখেই নির্ঘাত বলে দিত কখন লাড়ুমামা বাড়ি ভাড়া আদায়ে যাচ্ছেন, কখন বা উকিল-বাড়ি আর কোনটি ফল্‌স্‌। আমরা ঠিক ঠিক না বুঝে তবু যদি ডাকতাম—আসুন লাড়ুমামা এক কাপ চা খেয়ে যান।

চিত্ত বলতো—পেছু ডাকিস না, রেসের টিপ আনতে যাচ্ছে।

লাড়ুমামার পেশা কি ?—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক বাড়িগুলির ভাড়া আদায়।

অতএব মাসের পহেলা হপ্তায় লাড়ুমামা বেজায় ব্যস্ত।

বলতেন কি না বেজায় ব্যস্ত আছি ভাই। বড় ঝাম্যালা। চুইকা যাউক্‌ তারপর—। চুকে অবশ্য যেত। দিন সাতেক মাসের প্রথমে, ঝামেলা চুকে যেত। তারপর সারা মাস আড্ডা, আড্ডা আর আড্ডা।

'চায়ের আসরে' আমাদের আড্ডা তখন জম্‌জমাট্‌। আমরা বলতে—আমি, মণি, সঞ্জীব, অশোক, চিত্ত, সমীর, বীরুকাকা—বীরু-কাকা আসলে কাকা নয়। বীরেন দত্ত। আমাদের বন্ধু। রামধন পসারীর পাঁচনের মতই আদি—অকৃত্রিম। কিন্তু অভ্যাসের দোষ। কাকা হয়ে গেল।

ধরুন, বীরেনের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। আলাপের দ্বিতীয় দিনেই আপনার দাদার সঙ্গে মার্গ-সঙ্গীত থেকে আলামোহন দাস পর্যন্ত আলোচনা সারা।

তারপর বড় জোর এক হপ্তা। দেখবেন দাদাকে যথাস্থানে রেখে বীরেন আপনার চিনিমামার সঙ্গে আপনারই ভবিষ্যৎ আলোচনায় ঘন ঘন ঘাড় নাড়ছে। তখন সামনে দিয়ে তিনবার ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে দেখুন—বীরেন আপনাকে চেনে কি চেনে না।

অতএব আমরা ওকে বীরুকাকা বলতাম।

তবু বীরেন বন্ধুশ্রেষ্ঠ। কারু পার্সেন্টেজ্ নেই। ক্যাপস্টানের প্যাকেট পকেটে করে কে তার তদারক করে বেড়াবে—বীরুকাকা।

এবম্বিধ বৈতরণী পারের এক্স্পার্ট নেয়ে ছিলেন কালীদা—প্রোভোস্টের পি. এ.। অন্যদের সঙ্গে অন্যতর রেট ছিল, আমরা কালীদার আপনার লোক—কনসেশনে এক প্যাকেট ক্যাপস্টানেই কাজ হতো। আবার কারু বা মাইনে বাকী—পাড়ার মুদী দোকানে বীরেনের ধারের অঙ্ক বেড়ে গেল।

শুধু কি এই? তবে শুনুন।

সেবারে দিন পনের বীরুকাকা বেপাত্তা! চায়ের আসরে কামাই দিয়ে একদিন সকাল বেলা বীরেনের বাড়ীতে চড়াও হলাম।

বীরেন জানালো, সকালে বিকেলে দু-দুটো ট্যুইশানি করতে হচ্ছে।

ব্যাপার কি?

আর ব্যাপার—

হল-ক্যান্টিনে ষাট টাকার মত বাকী। আমাদের কাজ বাকী করা, সেটি তো সারা। বীরেনের কাজ শোধ দেওয়া সেটি এখনো বাকী। অতএব ওকে সকাল বিকেল ট্যুইশানি নিতে হলো।

য়ুনিভার্সিটিতে যখনই যেতাম বেশীর ভাগ সময় কাটতো ক্যান্টিনে—আড্ডায়। কখন যে ষাট টাকার কাছাকাছি বিল উঠেছে খেয়ালই করি নি। সঙ্গে টাকা থাকে তো দিয়েছি, না থাকে—লিখে রাখো।

লিখে লিখে ষাট ধরো-ধরো। অতএব বীরেনকেও ট্যুইশানি ধরতে হলো। এমন বন্ধু দুর্লভ, দেব-দুর্লভ।

আমরা চায়ের দোকানে চায়ের কাপে তুফান তুলেছি। সেই তুফানে কান্ট, হেগেল, মার্কস্—সব ধরাশায়ী, কথার ফানুশে ফানুশে আবার কাউকে সুদূর আকাশে তুলে ধরেছি—ক্লাস প্রায়ই করি নি—সময় কোথা?

আর বীরেন নিয়মিত ক্লাস করেছে। কিন্তু বাইরে থেকে

প্রয়োজনের জোগান দিয়েছে আমাদের আড্ডার। কারু পার্সেন্টেজ, কারু মাইনে, হল-ক্যান্টিনের বকেয়া—আরো কত কি!

য়ুনিভার্সিটিতে বীরুকাকা। চায়ের আসরে লাড়ুমামা।

আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওদের দুজনে তফাৎ বিস্তর। বীরেন কোনদিনই আড্ডায় বড় একটা জমত না। আসতো, কিরে? কেমন আছিস?—ব্যস্।

আর লাড়ুমামা এককোণে চুপ করে বসে থাকতেন। যতক্ষণ আড্ডা আছে, লাড়ুমামাও আছেন। মাঝে মাঝে অবাক লাগতো। আমাদের আড্ডায় লাড়ুমামা কেন আসেন? মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে, এই লাড়ুমামা একেবারে নিষ্প্রয়োজন—বাড়তি।

একসময়ে লাড়ুমামা বললেন—পল্টু, একরাউণ্ড হাফ্ দিয়ে দে।

পল্টু বিশ্বাস আধা-কাপ আধা-কাপ চা পরিবেশন করে গেল। আর সেই হাফ্ কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে মনে হতো এই 'হাফ্' এক্ষুণি কত না দরকার ছিল।

কখনো বা সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে ধরলেন। আমরা একটা একটা তুলে নিলাম। আর একটান টেনেই মনে হতো ঠিক এইটুকুরই দরকার ছিল—এই মুহূর্তে।

লাড়ুমামার প্রয়োজনটা একেবারে উপলব্ধিতে গিয়ে ঘা মারতো। লাড়ুমামা আড্ডাবাজ নয়, আড্ডাধর।

সঞ্জীবের মাকে কি সুবাদে জানা নেই দিদি বলে ডাকতেন। সেই হেতু সঞ্জীবের এবং একই কারণে আমাদেরও মামা। নইলে বয়সে লাড়ুমামা আমাদের থেকে মাত্তর চার-পাঁচ বছরের বড়।

তারও বছর চারেক আগেকার কথা বলছি। লাড়ুমামা তখন ক্লাস নাইনের ডাক্সাইটে ছাত্র। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই পাসও করতে পারেন, ফেলও করতে পারেন। এবং সেটা মোটেই পড়াশুনার ওপর নির্ভর করতো না, করতো মাস্টারমশাইদের বাড়ি ফেরার রাস্তার ওপর।

এই সময়ে ঢাকায় একবার রায়ট লাগল। সেই দাঙ্গায় স্কুলের

বৃদ্ধ মৌলভীকে চাকু মেরে লাড়ুমামা পাড়ায় হিরো হলেন। কুলোকেরা কুকথা বলবেই। একদল দুর্জন বলেছিল, এ লাড়ুর ব্যক্তিগত আক্রোশ।

একদিন ক্লাসে 'হৃদয়ঙ্গম' শব্দের অর্থ টা ঠিক বোধগম্য না হওয়ায় দুষ্ট মৌলভী নাকি লাড়ু হেন ছাত্রকে ঘণ্টাভর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এসব অবশ্য রটনা। তবে লাড়ুমামা সেই যে হিরো হলেন আর ইস্কুলের পথ মাড়ালেন না। একবার হিরো হয়ে গেলে ঐটে নাকি বড্ড বেমানান। লাড়ুমামার বাবা তখনো বেঁচে। চেষ্টা চরিত্তির করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই যখন আর হিরো পুত্রের উঁচু নজর স্কুল-নিচু করা সম্ভব নয় দেখলেন। তখন বাধ্য হয়েই ছেলেকে বাড়ি-ভাড়া আদায়ের এ্যাপ্রেনটিসিতে তালিম দিতে লাগলেন।

ভাবটা, অগত্যা যা আছে তাই নেড়ে চেড়ে খেতে শেখ। এতে কিন্তু জবর কাজ হল। লাড়ুমামার ছুরি মারার কাহিনীটা কাহিনীর নিয়মেই ডালপালা ছড়িয়ে ছিল। অতএব ঝটিতি ভাড়া আদায় হতে লাগলো।

তিনবার না ঘুরিয়ে যেসব ঘাঘু ভাড়াটে কিছুতেই ভাড়া দিত না তারা অবধি 'পইলা' তাগিদেই বাকীর কিস্তি শোধ দিতে শুরু করল।

চমৎকৃত পিতা অতঃপর বাপ-দাদার সম্পত্তি নিশ্চিন্তে লাড়ুর হাতে তুলে দিয়ে মরতে পেয়ে বাঁচলেন। বাঁচলেন, কারণ লাড়ু তো শুধু বাড়ি-ভাড়া আদায়ই শুরু করে নি। আরও যা শুরু করেছিলো তার একটা মদ, অপরটা রেস—আরও চায়ের আসরে আমাদের মাসান্তের বকেয়া শোধ করা। তিনটাই অপচয় এবং লাড়ুর মৃত-পিতার কাছে অতএব অপরাধ। তা ছাড়া অপচয় যখন, তখন তিনটাই সমান অপরাধ। তারতম্যে লাভ কি ?

কৃপণ পিতা অবশ্য এত সব দেখার আগেই গতায়ু হয়েছেন। দেখতে শুরু করেই আর বেশীদিন টেকেন নি।

কিন্তু লাড়ুমামা তেমন নন। তিনি আমাদের পেট্রন। মাসান্তের বহু বাকী বহু মাস ধরে হাতে ধরে গুণে দিয়েছেন। কিন্তু—হঠাৎ যেন ভাবনাটা হোঁচট খেয়েই থেমে গেল।

পেট্রন সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে কেন? ধূল-ঝাড়া ধুতি কই? আদ্দির পাঞ্জাবী? হঠাৎ দেখা হওয়ার চমকে এ-কথাগুলো এতক্ষণ মনেই হয় নি। কিন্তু, তাই তো! লাড়ুমামার এ হাল কেন?

কতদিন পরে দেখা। কত কথা জানবার ছিল, কত কথা বলবার। হলো না।

মণিকে লিখেছিলাম। লাড়ুমামার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল। ট্রামে যাচ্ছিলেন। ট্রামটা চলে গেল। ভাল করে কথা হলো না।

উত্তরে মণি লিখেছিল: জীবনের ট্রাম অমনি ছুটিয়া চলিয়াছে। শুধুই কি লাড়ুমামা? যে কথা যাহাকে বলিতে চাই, কোনদিন বলা হয় নাই। যে কথা কোনদিন বলিতে চাহি নাই, তবুও বলিতেই হইয়াছে। সে-বলার ফলাফল বারংবার জীবনে বর্তাইয়াছে। বর্তাইবেও। লাইফ ইজ ইনটারেস্টিং—বোধ হয় এইজন্যই এত ইনটারেস্টিং—অতএব দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

সঞ্জীব তখন কলকাতায়। কদিন থেকে চেষ্টা করেও দেখা পাই নি। একদিন দেখা হতে বললাম, লাড়ুমামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি একটু জড়িয়ে পড়েছিস?

সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল—ছাখ, বেঁচে থাকাটাকে যদি ইনটারেস্টিং করতে চাস্ তবে তুইও জড়িয়ে পড়। জড়িয়েই যদি না পড়লি তবে লাইফে চার্ম কই? যারাই জীবনে কোন না কোন ইণ্টারেস্ট খুঁজে পেয়েছে, খোঁজ করে ছাখ কিছু একটা নিয়ে জড়িয়ে গেছে বলেই। যে যায় নি সে-ই স্থবির—ডেড, যা কিছু প্রোগ্রেস, যা কিছু প্রাণচঞ্চল—এই যে পৃথিবী বন্ বন্ করে লাট্টুর মত ঘুরছে তাও আবার সূর্যের পিছু পিছু ঘুর্ণিবাই—কেন? জড়িয়ে গেছে বলেই না?

সঞ্জীবের কথার এ্যাক্‌সেণ্ট্‌ই আলাদা। গানের চেয়ে গমকের প্রাধান্য। চিরদিন যেমন, আজও চুপ করেই রইলাম। বোবার শত্রু নেই।

ড্রইংরুমটাকে মাঝখানে রেখে বারান্দাটা ঘুরে দুপাশে দুমুখো ভেতর-বাড়ীর দিকে ছুটেছে—আমিও ছুটেই ছিলাম। কিন্তু একেবারে মুখপাতে পড়ে গেলাম। ড্রইংরুমে বসেছিলেন মণির বাবা। ডাকলেন, ওহে অমল, শোন তো।

শুনতেই হলো।

—আমার ছেলে মণি সেন, তোমরা বল, একটি জুয়েল। ছেলে জুয়েল হোক, কোন বাপ এ না-চায়—কিন্তু আমি তো কিছু প্রমাণ চাই।

প্রমাণাভাবে কাঠ-মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—ইদানীং তোমার পাল্লায় পড়ে পলিটিক্সের সখ হয়েছে। ইন ফ্যাক্টি, আই ডোণ্ট মাইণ্ড দ্যাট। বাট হোয়েনেভার্ আই সি হিজ নেম ইন দি নিউজপেপার, প্রিসিডেড্ বাই ওয়ান গার্ল এণ্ড ফলোড বাই য়্যানাদার, হোয়াই দিস্, হোয়াই দিস্?

শেষের হোয়াইটা বললেন বেশ গলা ঝেড়ে এবং সেই থেকে ঠায় আমার দিকে চেয়ে।

রাজনীতি অর্থে ছাত্র-আন্দোলন করতাম। যে সময়টার কথা বলছি, মেয়েরা আজকের মত এমন বেরিয়ে আসে নি। তাই বলতে চাইলেই মেয়েদের সুযোগ দিতাম আর প্রায়ই বক্তব্যটাকে গুলিয়ে ফেলত বলেই মেয়েদের পরে পরেই ছেলেদের কারু বলতে হতো। যেমন সমীর বোস, বাসবী নন্দী, মণি সেন, বাসনা রক্ষিত ইত্যাদি—প্রিসিডেড বাই বাসবী এণ্ড ফলোড বাই বাসনা, অমনি কোন বেসামাল কাগজের পাতায় মণিকে দেখে থাকবেন। কিন্তু পুত্রবৎসল দুর্বলচিত্ত পিতাকে কি করে বোঝাই যে দোষটা মণির নয় বোধ করি

কাগজওলাদেরও নয়। মনে মনে ভাবলাম যদি কোন উপায়ে একবার ঐ মেয়েদের চেহারা দেখাতে পারতাম!—

তিনি চুপ করে ছিলেন। আবার বললেন, আজ দিন পনের কলেজ যায় না। ভাবি কি ব্যাপার? তোমাদের ইংরিজির ঐ ছোক্‌রা মাষ্টের—ঐ ঘোষ হে—বলে গেলো, কোন্ মেয়ের প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে—জুয়েল্!

আমি তো যাই আর কি!

এবারে আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় দয়া হয়ে থাকবে, বললেন— জুয়েলটি বোধ হয় ভেতরেই আছে। যাও একটু সৎসঙ্গ কর।

গুটি গুটি কেটে পড়লাম।

বলা তো চলে না, নইলে এই প্রক্সির ব্যাপারেও মণি নির্দোষ। অবশ্য, যদি প্রক্সি দেওয়াকে বৈধ বলেন।

সঞ্জীবের সাধু ইচ্ছা কল্যাণীর সঙ্গে মণির একটা কিছু হোক। এই একটা কিছু যে কি সঞ্জীব কোনদিন পরিষ্কার করে বলে নি। কল্যাণী মণির একই সঙ্গে ইংরিজী পড়ে। চেহারায় তিলোত্তমা। লেখাপড়ায় মাঝারী উত্তম। ফার্স্ট ক্লাসের বড় সখ। প্রফেসরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। নোট নেয়, মন জুগিয়ে চলে। ভালো ছেলেদেরও খবর রাখে। অতএব মণিরও।

এই কল্যাণী অঞ্জলিকে গল্প করেছে, মণি ক্লাসে থাকলে অধ্যাপকেরা ভয়ে ভয়ে পড়ান। কথাটা সর্বাঙ্গ সত্য নয়। ভালো ছেলে বলে অধ্যাপক মহলে মণির সুনাম অবশ্যই ছিল। কোন-কিছুর সঠিক তাৎপর্য নিয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে মতান্তরও হয়ত বার কয়েক হয়ে থাকবে। এ তারই অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি। আর এই অতিরঞ্জনটাই সঞ্জীবকে উৎসাহিত করেছে। ওর ইচ্ছা—বেশ তো অন্ততঃ আলাপচারী তো ভালো করে হয়ে থাক।

মণিকে জিজ্ঞেস করে, কল্যাণীকে চিনিস?

—চিনি, আলাপ নেই।

—আলাপ করিস না কেন?

—দরকার হয় নি।

—ওর নোট তোর চাই? আনিয়ে দেবো?

—দরকার নেই।

—মাস্টারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভালো নোট জোগাড় করেছে ও।

—তা হোক্।

তাকিয়ে তাকিয়ে মণির মুখের রেখায় সঞ্জীব কি যে খুঁজে বেড়ায়। একদিন হঠাৎ বললে, কল্যাণীর বাড়ী চিনিস?

—না তো!

—পাঁচের এক প্যারী স্থর লেন, এই বইটা একটু পৌঁছে দিবি?

—পারবো না।

মণি স্পষ্ট অস্বীকার করে। আর সঞ্জীবেরও রোখ চেপে যায়। বলে, তোমাকে শা—আর শেষ করে না।

একদিন কলেজের লনে বসে আড্ডা মারছি আমরা। অনেকেই। মণির ক্লাস ছিল। বলল, উঠলাম রে।

সঞ্জীব জিজ্ঞেস করল, ক্লাসে যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—কল্যাণীকে একটা কথা বলতে পারবি?

—কি কথা?

—বলবি, অঞ্জলি যেতে বলেছে।

—পারবো না।

—কেন?

মণি ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সঞ্জীব চেঁচিয়ে বলল, রোল নাম্বার ফিফ্‌টি সিক্সটা প্রক্সি দিসতো।

—কতো?

—ফিফ্‌টি সিক্স।

—আচ্ছা।

ক্লাসে অধ্যাপক নাম ডাকলেন, ফিফ্‌টি টু, ফিফ্‌টি থ্রি, ফিফ্‌টি ফোর, ফিফ্‌টি ফাইভ, ফিফ্‌টি সিক্স—

মণি বলল, ইয়েস্ স্যার।

অধ্যাপক আবার বললেন, ফিফ্‌টি সিক্স্?

মণি স্পষ্টতর কণ্ঠে বললে, প্রেজেন্ট স্যার।

—রোল নাম্বার ফিফ্‌টি সিক্স্ স্ট্যাণ্ড আপ—

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মণিই দাঁড়াল। আর এবারে অধ্যাপকও হেসে ফেললেন। হেসেই বললেন, ইউ আর নট ফিফ্‌টি সিক্স্, তুমি বসো।

কিছু একটা গোলমাল হয়েইছে, তিনি বুঝেছিলেন—কারণ মণিকে অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করছেন তো।

এদিকে ক্লাস-সুদ্ধ হাসির তুফান। মণি ভাবে ব্যাপার কি? এত হাসি কেন? এদিক ওদিক লজ্জিত চোখে তাকায়। অধ্যাপক সবাইকে ধমকে উঠে বললেন, সাইলেন্স্—তারপর পড়াতে লাগলেন। ক্লাস শেষে অধ্যাপক বেরিয়ে যেতেই হাসিটা আবার দানা বাঁধল। আর দুচারটে 'আওয়াজ'।

আর তারই এক ফাঁকে কল্যাণী এসে কাছে দাঁড়াল। কঠিন চোখে তাকিয়ে কি একটা কটু কথা বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। শুধু বললে, আপনাকে কিন্তু ভদ্রলোক ভেবেছিলাম।

—কিছু বললেন?

কল্যাণী আর কিছুই বলে নি। ওরও কেমন সন্দেহ হলো, কোথায় কি একটা গোল আছেই। হাসি, ঠাট্টা, টিপ্পনি, কল্যাণী—সমস্ত অবস্থাটা যখন বুদ্ধির আয়ত্তে এলো, মণির শুধু একথাই মনে হয়েছিল, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আর বুঝেও লাভ নেই।

কাউকেই আর কিছু বলল না। এমন কী সঞ্জীবকেও না। শুধু ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

তারই আজ দিন পনের।

কালোপুলের ওপর বসে আমি আর মণি পা দোলাচ্ছি। মনে হয় এইতো সেদিনের কথা।

সাড়ে-নটার গাড়ি দূর থেকে কুঁই শব্দে জানান দেবে, সশব্দে ব্রীজ কাঁপিয়ে চলেও যাবে। আমরা দুজনে পুল থেকে নেমে টিকাটুলির পথ ধরবো। আর অঞ্জলির সঙ্গে গল্প-করা সেরে সঞ্জীবও তক্ষুণি আসবে।

শেষে এ একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সন্ধ্যাটা রাতের পথ মাড়াতেই আমরাও উঠে পড়তাম। আমি, মণি, সঞ্জীব।

চায়ের আসর থেকে বেরিয়ে বলধার বাড়ি বাঁয়ে রেখে কবরখানার পাশেপাশে এগিয়ে যেতাম। রেল গেটের সামনে এসে বাঁদিকে ফোল্ডার স্ট্রীটে মোড় নিয়ে গল্পে গল্পে চলেছি তিনজন। আমি, মণি, সঞ্জীব।

কালোপুলের পাশে এসেই আমি আর মণি দাঁড়িয়ে পড়তাম। আর লাইন ডিঙ্গিয়ে সঞ্জীব টিকাটুলিতে ঢুকতো।

কোনদিন বলত—চলে যাবি না যেন। কোনদিন তাও না। আমরা যেতাম না। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে সব গল্প, সব কথা, শেষ করে অবশেষে কালোপুলের রেলিংয়ে উঠে বসে নিঃশব্দে পা দোলাতাম।

রেল লাইনের ওপর দিয়ে এই ওভার-ব্রীজটা ওয়ারী ও টিকাটুলির যোগস্থাপনা করেছে। টিনের দেওয়াল ঘন আলকাতরায় ছোপান। তাই নাম কালোপুল।

কালোপুলে বসে পা দোলাতাম আর অপেক্ষা করতাম আমরা। কখন সাড়ে-নটার গাড়ি দূর থেকে কুঁই শব্দে জানান দেবে। কখন সশব্দে পুল কাঁপিয়ে চলেও যাবে। কালোপুলের টিনের দেয়াল থর থর করে কেঁপে কেঁপে আবার স্থির হয়ে যাবে। গাড়িটা পুল পেরিয়ে যেতেই আমরা দুজন টিকাটুলির মোড়ের দিকে এগোতে

থাকবো। অঞ্জলির সঙ্গে গল্প সেরে সঞ্জীব তখনই আসবে কি না। কি এত গল্প করে সঞ্জীব? কোনদিন জিজ্ঞেস করি নি কিন্তু।

হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে, আবার কোন দিন বা রমনার ঘুর-পথে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি ফিরতাম অনেক রাতে।

একদিন সঞ্জীব ফিরতেই মণি প্রশ্ন করল—কি করছিলি এতক্ষণ?

—কেন? গল্প করছিলাম।

শুধু গল্প? এ প্রশ্ন মণি করে নি। ভেবেছিল। সেদিন ভেবেছিল শুধু। আর পরে একদিন আমায় বলেছিল।

কালোপুলের ওপর বসেছিলাম আমরা দুজন। সঞ্জীব যথারীতি অঞ্জলিদের বাড়ি গেছে। মণিই তুলল প্রসঙ্গটা।

—জানিস, অঞ্জলি সঞ্জীবের চেয়ে প্রায় তিন-চার বছরের বড় বয়সে।—আমি সরাসরি আসল জায়গায় ঘা করলাম। সোজা প্রশ্ন করলাম—তোর কি ধারণা সঞ্জীব ভুল করছে?

একটু চুপ করে রইল মণি। তারপর আস্তে আস্তে বলল—বললে তো গল্প করছে।

—তাতে কি বোঝায়?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। মণি আর উত্তর করে না দেখে আমিই তাড়া দিলাম।—কিছু বলছিস্ না যে?

—ভাবছি।—আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, ভাবছি যা বলল সেইটাই গল্প কি না!

তারপর আরো একটু থেমে নিজে থেকেই বলল মণি:

—সেদিন য়ুনিভার্সিটিতে শুনলাম। অঞ্জলি অনুপমের দিদি। কেমন খট্‌কা লাগল। অনুপমকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও তাই বললে। বছর দুই আগে এম. এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। এই ছেড়ে দেওয়ার পেছনে নাকি একটা ছেলে-ঘটিত ইতিহাস আছে। তাই না সঞ্জীবকে সেদিন জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু ও যেমন সংক্ষেপে উত্তর দিল, তাতে মনে হয় ঠিক আলোচনার মধ্যে আসতে চায় না ও। শুধু গল্প নয়। তাহলে তো রাজ্যের সব গল্প শেষ হয়ে গেছে এতদিনে।

তার বেশী কিছু আছেই। সেটাই কতটুকু জানার ইচ্ছা ছিল। শেষ-পর্যন্ত না একটা আঘাত পায়।—একটু থেমে আবার বলল—পাবেই এমন কথা বলি না তবে সম্ভাবনার দিকটাও আমার মনে হয়েছে।

আলোচনাটা এখানেই থেমেছিল আমাদের। আমরা কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। সঞ্জীবকেও কিছু বলি নি। বলার ইচ্ছে আমার মণির—দুজনেরই ছিল। দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না যেন।

আর আশ্চর্য, কদিন পরে সঞ্জীব নিজে থেকেই বলল একদিন। প্রিয়জনের কাছে আঘাত পেলে, সে আঘাত যে কতখানি—মনে যখন বোঝা হয়ে চেপে থাকে, সে দুর্বহ বোঝার হাত থেকে রেহাই পেতেই কারো না কারো কাছে মন খুলে বলতে হয়।

আমরা ছাড়া সঞ্জীব আর কাকেই বা বলবে। আমাদেরই বলেছিল সঞ্জীব।

সেদিন। সাড়ে-নটার গাড়ি তখনো আসে নি। ফিরে এলো সঞ্জীব। এসেই আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। রেলিংয়ে বসেছিলাম আমরা দুজন। আমি, মণি। আমাদের দুজনের চোখে চোখে নীরবেই যেন কি কথা হয়ে গেল। একেই বোধহয় ইনট্যুইশন্ বলে। আমরা চোখে চোখে, যে সম্ভাবনাটা এতদিন আশঙ্কা করেছিলাম যেন সেটাকেই কনফার্ম করলাম। নিজেদের অজ্ঞাতেই। তবু চুপ করেই রইলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সঞ্জীব। তারপর দুহাতে রেলিংটাকে জোরে নাড়া দিয়ে—মন থেকে কোন একটা চিন্তা সমস্যাকে ঝেড়ে ফেলে, যার প্রতিফলন হল হাতের নাড়াটা, সঞ্জীব বলল, চল রমনার দিকে ঘুরে আসি একটু।—বলেই চলতে লাগল। রেলিং থেকে নেমে দুজনে নীরবে ওর অনুসরণ করলাম। সঞ্জীব আগে-আগে চলছিল নীরবেই।

একসময় সঞ্জীবই আবার কথা বলল—জানিস্, অঞ্জলি আমায় বোকা বলল।

জানতাম না। কিন্তু একদিন হয়ত বলতই এ যেন জানতাম। আমাতে মণিতে আবার চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। রমনার মাঠে পড়েছি। সঞ্জীব বলল—চল টিলাটার ওপর বসা যাক্। ছোট একটা মাটির ঢিবি। বিকেলে বেড়াতে এসে ছোট ছোট ছেলেরা এখানে রাজা-রাজা খেলে। এই ঢিবিটা তাদের সিংহাসন। অদূরে ওয়ারী ক্লাবের আলো দেখা যায়। এখানে অন্ধকারে আমরা তিনজন সিংহাসনে উঠে বসলাম।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। আবার সঞ্জীবই বলল, অঞ্জলি আমায় বোকা বলল, কেন রে ?

এবারে আমি বললাম, খুলেই বল্ না কি হয়েছে ?

খুলেই বলেছিল সঞ্জীব।—অঞ্জলির বন্ধু অপ্সরা সেন সেদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে এসেছিল অঞ্জলিদের বাড়ি। অঞ্জলি ওকে অপ্সরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অপ্সরাকে আলাপ করিয়ে দিয়ে অঞ্জলি বলল—এই অপ্সরা সেন, যার চোখের দিকে চাইলেই সদ্য বিলেত-ফেরা ব্যারিস্টার শরদিন্দু মজুমদারের বুকের ভেতরটা খচ্ খচ্ করে।

—কি যা তা বলছিস ?—বলেছিল অপ্সরা।

—যা তা ?—হেসে অঞ্জলি বলল, জানিস সঞ্জীব, শরদিন্দুবাবু বলেছেন, কত দেশ ঘুরলাম। কত মেয়ে দেখলাম। কত সুন্দর চোখের মেলা। কালো চোখ, নীল চোখ, কটা চোখ, যে চোখ হাতছানি দিয়ে ডাকে—কিন্তু তোমার মত এমনটি কোত্থাও না। চাইলেই বুকের মধ্যেটা খচ্খচ্ করে। এ তোমার কি চোখ অপ্সরা ?

এই গল্পটাই এইমাত্র অপ্সরা বান্ধবীকে বলেছিল। সঞ্জীব আসতেই ওকেও পরিবেশন করল অঞ্জলি।

অপ্সরা লজ্জা পেল। বুক খচ্খচ্ করা চোখ তুলে আর সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলতে পারলো না। এই প্রথম আলাপ তো। একটু বসে থেকে তারপর অস্বস্তিতে উঠেই পড়ল—আজ যাই রে অঞ্জু,—বলে চলে গেল।

আর অসহ্য রাগে ফেটে পড়ে অঞ্জলি বলল, খুব জব্দ, আমায় ব্যারিস্টার দেখাতে এসেছেন!

তারপর সঞ্জীবের কাছ ঘেঁসে এসে বলল, চল ছাতে যাই।

এইটে ওদের নিত্যকার প্রোগ্রাম। ছাদে সন্ধ্যার পরেই একটা পাটি পেতে রাখে অঞ্জলি। অঞ্জলি বসবে। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে সঞ্জীব। এই গল্প, সেই গল্প। কখনো বা সঞ্জীবের চুলে বিলি কেটে দেয় অঞ্জলি। কখনো বা আঙুল টানার নাম করে হাতটা টেনে নিয়ে খেলা করে। আরো অস্থির হলে অঞ্জলি ঝুঁকে পড়ে। বুকভরা গভীর দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে—ভালো লাগে না রে।—আর তখন অঞ্জলির মুখটা সঞ্জীবের মুখ ছুঁইছুঁই করছে। সঞ্জীব তবু বুঝত না। সঞ্জীব বোকা বই কি।

সেদিন অঞ্জলি অস্থিরতর। কিন্তু সেদিনও সঞ্জীব বোঝে নি। বোঝে নি অঞ্জলি কি চায়।

অতএব ছাদেও আর বেশীক্ষণ ভাল লাগে নি অঞ্জলির। বলল—চল্ নীচে যাই।

—চল্।

আর ছাদ থেকে নামার অন্ধকার সিঁড়ি-পথে সঞ্জীবকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে অঞ্জলি বলল—উঃ বাবা!

—কি হলো?

—একটা ইঁদুর কামড়ে দিলে।—ভয়ে আলিঙ্গন ঘনতর করলো অঞ্জলি।

কষ্টে অঞ্জলির হাত ছাড়িয়ে সঞ্জীব পকেট থেকে দেশলাই বের করল। একটি একটি করে দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি পর্যন্ত জ্বেলে প্রতিটি সিঁড়ি আঁতিপাতি করে খুঁজল। কিন্তু হায় ইঁদুরটাকে তবু পাওয়া গেল না।

আর অঞ্জলি দাঁতে ঠোঁট কাম্ড়ে সিঁড়ি-পথের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঞ্জীবের ইঁদুর-খোঁজা দেখল।

দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটি জ্বেলে খালি বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে সঞ্জীব যখন বললে, পেলাম না রে।

অঞ্জলি বললে, পাবিও না।—একটু থেমে বললে, তুই বড় বোকা সঞ্জীব, আবার একটু থেমে অঞ্জলি বলেছিল, তুই আজ চলে যা। আমি আর নীচে নামবো না।—সঞ্জীব কিছু বলবার আগেই অঞ্জলি আবার ছাদে উঠে গেল। সঞ্জীব একবার ভাবলো ওর পিছু-পিছু ফের ছাদেই উঠে যায়। কিন্তু অঞ্জলি চলে যেতে বলল! অমন করে বলতে পারলো? কি ভেবে থেমে দাঁড়াল সঞ্জীব। তারপর অভ্যস্ত অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নীচেই নেমে এলো। নীচে নেমে ও আর দাঁড়ালো না।

প্রত্যহের মত অঞ্জলি গেটে এগিয়ে দিতে আসে নি তো। গেট পেরিয়ে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে ছাদের আলিসায় তাকিয়ে ছিল সঞ্জীব। না অঞ্জলি ছিল না সেখানে। আর এইটেই সঞ্জীবকে ভীষণ লেগেছে। অন্ততঃ ছাদের আলিসায় দাঁড়িয়ে থাকবে অঞ্জলি, এ আশা করেছিল ও।—বলার পর অনেকক্ষণ সবাই চুপ করে ছিলাম। সঞ্জীবই আবার নীরবতা ভাঙলো—কিছুই বলছিস না যে?

আমিও ঠিক করে ফেলেছিলাম ততক্ষণে, বলবো। বলতেই হবে। আস্তে আস্তে বললাম, সঞ্জীব, মনেরও একটা বয়স আছে। আর বিশেষ বয়সের একটা বিশেষ দাবীও আছে। অঞ্জলি যা চায় তা দেবার ক্ষমতা তোর নেই। তুই যতটুকু দিতে পারিস, তার প্রয়োজন ওর আগেই ফুরিয়েছে।

মূক-মৌন তিনজন কত রাত পর্যন্ত সেদিন রমনার টিলায় বসে থেকে কাটিয়েছিলাম যে!

তার পরের দিনের ডাকেই অঞ্জলি পেয়েছিল চিঠিটা ঃ

অঞ্জলি,

তোমাতে আর ইঁদুরটাতে, দুজনে মিলে কাল রাতে আমার মনের কৈশোর ঘুচিয়ে দিলে,—তোমাকে ধন্যবাদ। না-দেখা ইঁদুরটাকেও।—সঞ্জীব।

চায়ের আসরে আসবার আগেই মণিকে ধরলাম ওর বাড়ীতে।

—কিরে য়ুনিভার্সিটি কি একেবারে ছেড়েই দিবি?

—ভাবছি।

—কি ভাবছিস?

—ভাবছি, কি করা যায়!

—এত কি ভাবার আছে? একটা ভুল হয়ে গেছে, তাও অনিচ্ছাকৃত।

—তবু লজ্জা করছে—মণি হাসবার চেষ্টা করল।

—স্বাভাবিক। কিন্তু লজ্জা-কালটা একটু বেশি বেমানান হয়ে যাচ্ছে না?

—তবু -কল্যাণী বলল কি না, আপনাকে কিন্তু ভদ্রলোক ভাবতাম। ঐ কিন্তুটার জন্যই মনস্থির করতে পারছি না। এইটা অস্বীকার করে লাভ নেই—আমরা, মানে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে ডিসেন্সী, ডেকোরাম—এ সবের বড় একটা ধার ধারি না। শুধু কল্যাণী নয় প্রায় সব মেয়ের এ অভিযোগ প্রকাশ্যে না-হলেও আমাদের ছেলেদের বিরুদ্ধে আছে। এটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি এমনিতেই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি কম। যখনি বলি, এটা মনে রাখি। সঞ্জীবটার জন্য অযথা তবু অপবাদ নিতে হলো।

—তাই বলে তো আর পড়া ছেড়ে দেওয়া চলে না—

—তাই তো ভাবছি।

—বেশ তাই ভাব।—রাগ করেই চলে এলাম।

একবার ভাবলাম সঞ্জীবকেও ধমকে দি আচ্ছা করে। ওর বাড়ির কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরে এলাম। অঞ্জলির ব্যাপারটায় এমনিতেই ও মনমরা হয়েছিল, তার ওপর আর গালমন্দ করতে ইচ্ছে হলো না।

কিন্তু কি করা যায়!

ভাবতে ভাবতেই সোজা চলে এলাম কল্যাণীর বাড়ি। পাঁচের এক প্যারী স্থুর লেন, ঠিকানাটা মনে ছিল। কড়া নাড়তে চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

—কল্যাণী বাড়ি আছেন ?

—আছেন।

—বলো যে, য়ুনিভার্সিটি ইউনিয়নের সেক্রেটারী একটু দেখা করতে চায়।

এলো কল্যাণী।

বললাম, আমাকে আপনি চেনেন না ?

—খুব চিনি। বলল কল্যাণী,—যা বক্তৃতা করেন আপনি—। শেষ না করেই হাসলো। পরে বলল—তা কি ব্যাপার বলুন তো ?

—ব্যাপার গুরুতর বটে। আমিও হেসেই বললাম, কিন্তু কি ভাবে শুরু করব তাই ভাবছি।

—আস্থন, ভেতরে বসবেন।

ওর পিছু পিছু গিয়ে বসলাম, ওর পড়ার ঘরে।

এবারে মনে হলো, না এলেই ভালো করতাম। একবার বীরু-কাকার কথাও মনে হলো। এটা ওরই লাইন। ওকে পাঠালেই হতো। অথচ এখন আর ফেরাও চলে না। অতএব বলেই ফেললাম।

—মণিকে আপনি ভুল বুঝেছেন।

—তাতে আপনার কি ?—মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল কল্যাণী। তারপর রূঢ়তাটা ঢাকবার প্রয়াসে হেসে—বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই রূঢ়তর হয়ে বলল—এসব ব্যাপারে ওকালতিটা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি, অমলবাবু।

ওর এই যুদ্ধং-দেহি ভাবটাই আমাকেও কঠিন করে তুলল। আর মুহূর্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ঠিক করে ফেললাম, এসেছিই যখন যুদ্ধে জয় করে যেতে হবে। মানুষ প্রতি মুহূর্তেই সংগ্রাম করে। প্রতিটি মুহূর্তের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। আমিও তৈরি হলাম।

একরকমের হাসি আছে, সেটা ঠিক হাসি নয়। আমি যে হাসির কথা বলছি না, ঠাট্টা করতে আসি নি, এইটেই বোঝাবার জন্যে একটু হেসে-থেমে হেসে-থেমে বক্তব্যটাকে একেবারে মনের মধ্যে মেপে মেপে গেঁথে দেওয়া। আমি সেই একটু হেসে একটু থেমে বললাম,—আপনি রূঢ় হয়েছেন, মণি আমার বন্ধু, ও যখন শুনবে ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছিলাম ওরও মুখের রেখা জানি কঠিনতর হবে। তবে ও ভদ্রলোক, এ নিয়ে বাক্-বিতণ্ডার অশোভনতাটা এড়িয়ে যাবে। আর—

—সত্যি আমি অশোভন রকম রূঢ় হয়েছি।—নিমেষে জল হয়ে গিয়ে কল্যাণী বলল, আমায় ক্ষমা করবেন।

আমি আমার কথার খেই ধরেই বলে গেলাম, আর উপেক্ষাটা আরও পীড়াদায়ক। তবু সমস্ত ব্যাপারটা জানি বলেই না-এসেও পারলাম না।

কল্যাণী চুপ করেই ছিল। সঞ্জীবের নাম বললাম না। সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে ওকে বললাম। আরও বললাম, তখন কেউ বুঝে উঠি নি যে ওটা কোন মেয়ের রোল নাম্বার হবে। আর তাছাড়া অনভ্যাসজনিত, অথবা মেলামেশার যথেষ্ট সহজ সুযোগের অভাব-ঘটিত—কারণ যা-ই হোক, আমরা ছেলেরা কথায় আচরণে মেয়েদের প্রতি একটু অশালীন। ক্লাসে লক্ষ্য করে থাকবেন, মণি এর ব্যতিক্রম। আর পাঁচটা ছেলের অভব্যতাটা নিজের ব্যবহারে ও বরং কম্পেনসেট্ করতে চায়। তাই আপনি যে 'অভদ্র' বলেছেন এইটে ওকে খুবই লেগেছে।--মণির কথাটাকেই একটু পাঞ্চ করে কাজে লাগালাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কল্যাণী অবশেষে বললে,—তা, আমাকে কি করতে হবে?

—যাক্ বাঁচা গেল।—দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে পরিহাসের সুরেই বললাম এবারে।—কষ্টকরে একদিন আসতে হবে আমার বাড়ি। মণিকেও বলবো।

—তা আপনার বাড়িতে কেন? য়ুনিভার্সিটিতেই করুন না কোথাও।

—তা হলেই মণি ভেগে পড়বে। বড্ড শাই কিনা! দেখছেন না, কলেজে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। আপনি সময় দিলে ওকেও আসতে বলবো আমার বাড়ি, সেই সময়টাতে। আগে থেকে কিছু বলা ঠিক হবে না।

একটু ভেবে নিয়ে কল্যাণী বলল—বেশ, কবে যাবো বলুন?

ও আমায় বিশ্বাস করেছে। আমি মণির এজেণ্ট নই, শুভানুধ্যায়ী। বললাম—শনিবারে আসুন না—এই চারটে নাগাদ।

উঠে আসার আগে বললাম—মণি বলছিল যে কলকাতা চলে যাবে। ভাবলাম, একটা সামান্য ব্যাপার, মিটিয়ে নেওয়া যাবে না? তা ছাড়া, ও চলে গেলে ছাত্র-আন্দোলনের দিক থেকে আমাদের খানিকটা সাফার করতে হবে—

—ওসব ও করে নাকি?

—করে বৈকি।

—সিরিয়স্?

—নিশ্চয়ই, বাঃ।

—আপনার পয়েণ্ট অব ইণ্টারেস্টটা এতক্ষণে বোঝা গেল। কল্যাণী হাসতে হাসতে বললো।

হাসতে হাসতেই চলে এলাম। ওর পয়েণ্ট অব ইণ্টারেস্টটাও যে ধরা পড়ে গেছে এ তো আর তক্ষুণি বলা চলে না!

মনটা বেশ ভাল লাগছিল। বেশ কায়দা করে গুছিয়ে এনেছি কিন্তু। নিজেকে নিজেই বাহবা দিলাম মনে মনে। আজ সে কথা মনে হলে হাসি পায়। কারো ভালো করতে চাওয়া আর কারো ভালো করতে পারা—দুইএ কত না তফাৎ।

সমস্যার সব জট প্রায় খুলে এনেছি ভেবে যখন মনে মনে একটা স্বস্তির সুর গুন্‌গুনিয়ে উঠেছে, সেদিন কি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পেরেছিলাম যে এইটেই সমস্যাকে জটিলতর করবে?

সেই জটিলতার গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরে ঘুরে কল্যাণী তার জীবন দিল। আর মণি—? মণি বড় চাপা। এতদিন এত কাছে কাছে রয়েছি তবু ওকে আজও বুঝলাম কই!

প্রকাণ্ড বাড়ি বিন্দুসারদের। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম প্রায় মিনিট পনের। এর মধ্যে না ঢুকলো একটা লোক, না বেরুল বাড়ি থেকে। তবু চলে যাওয়া চলে না বিন্দুসারের সঙ্গে আজই দেখা করা চাই। তারপর এক সময় নিজেই ঢুকে পড়লাম। শ্বেত-পাথরের চওড়া বারান্দা। বাঁধানো উঠোন। ওপাশে ঠাকুরঘর; কি একটা মূর্তিও রয়েছে ভেতরে। দূর থেকে ভাল ঠাওর আসে না। এ পাশটাতেও তেমনি চওড়া বারান্দা, পাশে পাশে ঘর। বিরাট সেকেলে বাড়ী—কিন্তু লোকজন কই? একটু ইতস্তত করে ডান-দিকের বারান্দা ধরে এগোলাম।

হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার—এসো না, এসো না, এসো না।—চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। পাশের দরজা দিয়ে নিজেই এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। তারপর অত্যন্ত ব্যথিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে,—দিলে তো গোণাটা ভুল করে। এইখানে সাত নম্বরকে দাঁড় করিয়েছিলাম।

তারপর বারান্দার একেবারে কোণের দিকে চলে গিয়ে হাতনেড়ে বললেন, এই ধরো এক, এই ধরো দুই, এখানে তিন,—প্রত্যেকের জন্য হাতের ইসারায় একটা একটা জায়গা বরাদ্দ করে দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগলেন তিনি।—চার, পাঁচ, ছয়—আর আমার সামনে এসে, একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন সেই রকম হেসে বললেন,—এইখানে দাঁড় করিয়েছিলাম সাত নম্বরকে—সাত নয় আসলে সেইটিই টেক্কা, তোমায় দেখে ভেগে গেল। উলঙ্গ কি না!

তারপরেই সুর পাল্টে বললেন, সাত নম্বর কে ছিল জানো?—জাহ্নবী আমার জীবনের সপ্তম আর সেরা নটী।—আহা অমন নিতম্ব

আর হয় না। তোমায় দেখে পালিয়ে গেল। আরো একবার এমনি পালিয়ে গেছিলো। জানো? আমার কল্‌তা বাজারের বাড়িটায় থাকতো তখন জাহ্নবী।—একদিন গিয়েছি, সঙ্গে ছিল নবাবের ব্যাটা রহিমুদ্দিন্। ওকে দেখেই লজ্জায় পালিয়ে গেলো সেদিন। আর এলো না, এলোই না হে। বসে থেকে, থেকে, থেকে তারপর রাগ করে চলে এলাম। তবু খুশীও হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জাহ্নবী একনিষ্ঠা—জাহ্নবী শুধুই আমার। ভুল—ভুল করেছিলাম হে! আসলে সব মাগী।—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্তি, কুতঃ মানবাঃ—ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-বাক্য। স্ত্রীচরিত্র বোঝা বড় দায়। জানো ঐ বাস্টার্ড রহিম, রহিমের সঙ্গেই ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতায়, তারপর লক্ষ্ণৌয়ে। জহ্নু বাঈ নাম নিয়ে পরে শুনেছি গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো। কলকাতাও নাকি আসতো প্রায়ই—তবু যাই নি। ঘেন্না—ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।—হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে নিজের মনে মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি।

ততক্ষণে বুঝেছিলাম, ইনিই মহাভারত সা—বিন্দুসারের বাবা। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের পর্দায় আরও একটা ছবি ভেসে উঠলো। এইটে আমার শোনা গল্প। মহাভারতকে দেখেই মনে পড়লো। এক্কা চড়ে ফিরছিলেন মহাভারত সা। রাত দেড়টা কি দুটো হবে। বেশ্যা পট্টির অপ্রশস্ত রাস্তায় সামনে পড়লো নবাব বাড়ির মোটর গাড়ি। ঐ প্রথম মোটর গাড়ি নবাববাড়ির ইতিহাসে। হুড্ তোলা গাড়ি। চালাচ্ছেন নবাব-তনয় একরামুদ্দিন। অপটু হাত। মন্থর গতি। অসহিষ্ণু মহাভারত ঘন্টি বাজালেন রাস্তা ছাড়ার জন্য। রাস্তা ছাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, গলিটা এত অপরিসর। তবে স্পিড্ বাড়ানো চলে বৈকি মোটরের। মহাভারত ঘন্টি বাজালেন, আর মদে চুর একরামুদ্দিন একবার পিছনে ফিরে তাকালেন—কার এত স্পর্দ্ধা যে ঘন্টি বাজায় পেছন থেকে? ঘাড় [illegible] করে দেখলেন মহাভারত সা। অতএব গতি মন্থরতর হলো। মহাভারতের ঘন্টি বৃথাই রাস্তা ছাড়ার নির্দেশ বাজালো, একবার—দুবার—বারবার।

বড় রাস্তার মোড়ে এক্কা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল মোটরকে পেছনে ফেলে আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সেই মুহূর্তে মহাভারতের হাতের চাবুক এক রক্ত-রেখায় বেয়াদপির শাস্তি এঁকে দিল এক্‌রামের সুশুভ্র গালে, নাকে, বাঁ চোখের ভুরুর ওপর।

আর তারপর দিনই 'রায়ট' লেগে গেল ঢাকায়। 'রায়ট'—হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

এই সেই মহাভারত সা। সুগৌর, সুঠাম দেহ, কে বল্‌বে বয়স সত্তর ধরি ধরি।

ভয়ে নয় শ্রদ্ধায় নয়—কি এক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। এই সেই আশ্চর্য মানুষ যাকে এক্‌রামুদ্দিন রাস্তা ছেড়ে দেন নি সে দিন। আর এই সেই আশ্চর্য পুরুষ যার একটা অন্যায় খেয়ালের খেসারৎ দিতে সারা সহর সেদিন দাঙ্গায় মেতে উঠেছিল।

আরো শুনেছিলাম। মহাভারতের বাপ রামায়ণ সাকে সেদিন পাঁচশো টাকার মদ কিনে ভেট পাঠাতে হলো নবাব বাড়িতে। তবে দাঙ্গা থামলো।

সেদিন অনেক রাত্তির পর্যন্ত নবাব বাড়ির নাচঘরে বসে। নবাব সেলিমুল্লা আর রামায়ণ সা দুই মাতাল পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে এত মদ টেনেছিলেন যে নাচঘরেই বেহুঁস্ রাতটা কেটে গেল দুজনের। পরদিন সকালেই রামায়ণ সা বাড়ি ফিরে মহাভারতকে বলেছিলেন, তুই আমার জাত মারলি মহী।

সেই প্রথম আর সেই শেষ—যবন নবাবের কোন জলসায় রামায়ণ আর মদ স্পর্শ করেন নি, শুনেছিলাম।

গল্পের মত মনে হয়। আর সেই গল্পের এক নায়ক এই তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

সুন্দর বুদ্ধি-দীপ্ত চোখ। সুগৌর সুঠাম দেহ। এই একটু আগে জেনেছি বলেই নইলে দেখে মনে হয় না, ইনি বিকৃত মস্তিষ্ক।

মহাভারত বললেন—তোমার কি চাই—

বললাম, বিন্দুসার আছে?

—বিন্দুসার? —উঁহু—খৃষ্টীয় তুই শত বাহাত্তর অব্দে বিন্দুসার দেহরক্ষা করেছেন। নেই। সময়ে আসতে হয়—বড় দেরি করে ফেলেছ।

এমনভাবে বললেন তিনি যেন পাঁচ মিনিটের জন্য দশটা পনেরোর গাড়ি ফেল করেছি আমি।

একবার মনে হলো ফিরে যাই। কিন্তু বিন্দুসারকে বড় দরকার। অনেকগুলি কাগজপত্র আজকেই সরিয়ে আনতে হবে আমার বাড়ি থেকে। বাড়ির সামনে সাদা-পোষাকী পুলিশের ঘোরাফেরা বড্ড বেড়েছে। মনে হচ্ছে যে-কোন দিন সার্চ হবে। অতএব আর একবার বিন্দুসারের খোঁজ নিতে চেষ্টা করি।

—আমি বলছিলাম যে—

—কিচ্ছু বলতে হবে না হে, আমি স-অ-ব জানি। তিনশত খৃষ্টাব্দ পূর্ব। মৌর-রাজবংশের স্থপয়িতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিন্দুসার—অপর নাম অমিত্রাঘাত পিতার সিংহাসনারোহন করেন। অষ্ট বিংশতিবর্ষকাল অমিত-বীর্যে রাজত্ব করিবার পর খৃষ্টাব্দ পূর্ব তুইশত বাহাত্তর শালে তিনি দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর সন তারিখ নিয়ে অবশ্য একটু ঐতিহাসিক মতান্তর আছে। তবে বেঁচে নেই ঠিক। অশোক তারই ছেলে—সেও বেঁচে নেই, কাল —কাল—সবাইকে গ্রাস করেছে। আমাকে তোমাকেও করবে। কাণ্ট্ হেল্প!—হাত উল্টে বুঝিয়ে দিলেন যে কাণ্ট্ হেল্প। এমনি সময় বিন্দুসার নেমে এলো নিচে। বারান্দার একেবারে ঐ কোণের সিঁড়ি দিয়ে স্যাণ্ডেলে ফট্‌ফট্ শব্দ তুলে। আমায় বললে, কি রে কখন এলি?—আর আমায় অবাক করে দিয়ে ঘৃণায় নাক কুঁচকে চাইল মহাভারতের দিকে—এই লম্পট, ওপরে যাও।

জীবনে অমন পিতৃসম্ভাষণ কখনো শুনি নি। অতএব অবাক হলাম। বিরক্তও। আর সেইটেই হয়তো ফুটে থাকবে আমার চোখে মুখেও, বিন্দুসার বলল, কিছু মনে করিস না অমল, আমি জানি এটা অত্যন্ত অশোভন। কিন্তু—তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, কোনদিন

সময় আসে, যদি সেদিনও ইচ্ছা থাকে তবে তোকেই সব বলবো। আজকের এই সকালটা ততদিন পর্যন্ত ভুলে যা।

মহাভারত চলে গেছেন ততক্ষণে! যে সিঁড়ি দিয়ে বিন্দুসার নীচে নেমে এল একটু আগেই সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কি এক করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন মহাভারত। সে দৃষ্টি আজও ভুলি নি। আজও চোখ বুঝলেই সেই চোখ দুটো আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।

পুলিশ কিছুই পেল না সার্চ করে। পাবার যা কিছু ছিল সরিয়ে ফেলেছিলাম বিন্দুসারের বাড়ি। তবু ধরে নিয়ে গেল ডি. আই. বি. অফিস পর্যন্ত। অযথা অপেক্ষা, বড় সাহেব, ছোট সাহেব, এই প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন—বাড়ি ফিরতে বেলা তিনটে বাজলো।

আর এক উৎপাত বাড়লো, সপ্তাহে তিন দিন থানায় হাজিরা দিতে হবে। এক য়ুনিভার্সিটি যাওয়া ছাড়া বাড়িতেই ইনটার্নড্ থাকতে হবে সারাক্ষণ।

এইসব ঝামেলায় ভুলেই গিয়েছিলাম দিনটা শনিবার।

কল্যাণী যখন এলো তখন খেয়াল হলো। বললাম, বসুন আপনি ওকে খবর পাঠাচ্ছি আমি।

একটা ছোট্ট স্লিপে লিখলাম, এক্ষুণি একবার আসবি।

চাকরটাকে ডেকে বললাম, মণিকে দিয়ে আয় তো এটা। বাড়িতে না পাস তো চায়ের আসরে দেখবি।—কল্যাণীকে বললাম, এই তো র‍্যাংকিন স্ট্রীটের মোড়েই ওর বাড়ি, দুমিনিটের পথ, পাঁচমিনিটে এসে যাবে।

এলোও তাই।—কি রে ছাড়া পেলি তবে?—বলে ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তারপর চাইল বারকয় আমার দিকে—টেবিলটার কোণের দিকে দাঁড়িয়ে একটা বই ওল্টাতে লাগলো। কল্যাণীই নীরবতা ভাঙলো, বললে, ক্লাসে যান না কেন?

মণি নিরুত্তর।

—কি চুপ করে আছেন যে?—কল্যাণীই প্রশ্ন করল আবার।

মণি তবু চুপ।

—আমি মার্জনা করলাম। এবার থেকে ভাল করে ক্লাস করুন—পরিহাস-তরল হাসতে হাসতেই বলেছিল কল্যাণী, সমস্ত ব্যাপারটাকেই হাল্কা করে দেবার জন্যেই। কিন্তু কি ঝড় যে ঘনিয়ে আসছে ও জানতো না। আমি বুঝেছিলাম। নিরুত্তর মণি তখনো টেবিলের ওপরে খোলা বইটার পাতায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে। অতি উত্তেজনায় কপালের সেই শিরাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আরও একদিন দেখেছিলাম।

ঢাকায় রাজনীতির দলাদলিটা ছিল রকমারী—দলে দলে, পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবের সঙ্গে ক্লাবের, পার্টিতে পার্টিতে। আর প্রায়ই শেষ নিষ্পত্তি হতো লাঠিবাজিতে, ছোরা-ছুরিতে।

এমনি একটা লাঠিবাজির মুহূর্তে এক বিশিষ্ট নেতা মারা পড়লেন আমাদেরই পঞ্চুর হাতে। তিনি কিন্তু মারামারি থামাতেই দুদলের মাঝখানে এগিয়ে এসেছিলেন—নিরস্ত্র। তবু, বে-দলের লোক পঞ্চুদের হাতে রেহাই মিলল না।

পার্টি আফিসে এইটে নিয়েই আলাপ হচ্ছিল। এক আধা-নেতা অপূর্ব যুক্তির জালে বোঝাতে চাইলেন, যে রাজনীতিতে দুটোই দল, একটা শত্রু অপরটা মিত্র। এবং যে মিত্র নয় অর্থাৎ আমার দলের নয়—ঠিক এই সময়ে, সেদিনও দেখেছিলাম মণিকে। কপালের মাঝ দিয়ে একটা শিরা এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। অতি উত্তেজনায় অত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিরাটা—ওর ঐরকম হতো। উঠে দাঁড়িয়ে কথার মাঝখানেই চিৎকার করে উঠলো—ব্রুটস্—তারপর ঘর ছেড়ে বেগে বেরিয়ে গেলো।

অমনি একটা কিছু ঘটবে নাকি? মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। কি যে করি! চাকরটাকেই ডেকে বললাম, ভোলাদা তোর চা হলো?

কল্যাণী কিন্তু অবস্থাটা আঁচ করতে পারে নি, তাছাড়া মণি

দাঁড়িয়েছিল ওর দিকে প্রায় পেছন ফিরে। ও ফের বললে—কাল থেকে তবে যাচ্ছেন ক্লাসে!

—ভাবছি।

—এতে ভাবার কি আছে আর?

—নেই?—এবারে ঘুরে দাঁড়াল মণি। গলায় বিষ ঢেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, নেই? কি জানেন, না চাইতেই ক্ষমা করে, বাড়ি বয়ে তাই জানিয়ে যায়—এইসব যীশুখ্রীষ্টদের কাজের পেছনে প্রায়ই একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেইটে সঠিক না জেনে অর্থাৎ প্রপার গার্ড-টার্ড না নিয়ে আবার ভুল করে বসাটা ঠিক হবে কি?

কল্যাণী হকচকিয়ে গেল প্রথমটা। এমন একটা পরিণতি ও একদম আশঙ্কা করে নি। পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে, ম্লান হেসে বলল, যীশুখ্রীষ্টরা তবু কি বলে জানেন? বলে, হে ঈশ্বর, এইসব অবোধদের তুমি ক্ষমা করো।

ভোলাদা বাঁচালে। একটা ট্রেতে তিন কাপ চা আর কিছু ভাজাভুজি সাজিয়ে হাজির হলো এই মোক্ষম সময়টিতে। আমি বললাম— এই যে ভোলাদা চা-টা এগিয়ে দে তো—। ভাবটা চট করে চলে যাস নি যেন। তুই গেলেই আবার ওরা শুরু করে দেবে। কিন্তু সে তো আর বলা যায় না। চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে চুপ করেই কাটল কিছুক্ষণ। হঠাৎ চা-টা এক চুমুকে শেষ করে মণি বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। যেতে যেতেই বলল -অমল, আমায় ক্ষমা করিস্।

—তবু বলতে পারলো না, কল্যাণী আমায় ক্ষমা করো—হাসতে হাসতেই বলতে শুরু করেছিল কল্যাণী, বলতে বলতে কিন্তু কেঁদে ফেলল।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবাক্য; স্ত্রীচরিত্র বোঝা দায়। মহাভারত সা বলেছিলেন, দেবাঃ ন জানন্তি—আমরা তো কোন ছার।

বাবা লিখেছিলেন, আমার এক বন্ধু যাচ্ছেন ঢাকায়। কিছুদিন থাকবেন আমাদের বাড়িতে। তুমি বন্দোবস্ত করো—দেখো ওঁদের অসুবিধা না হয়।

মিঃ সেন এলেন না। হোম ডিপার্টের বড় কর্মচারী, পদবীতে আই.সি.এস.,—হঠাৎ কাজে আটকে গেছেন। এলেন মিসেস সেন, তিন কন্যা—সুস্মিতা, সুনীতা, সুজাতা—তা বেশ।

কিন্তু মুস্কিল হল আমার।

আমাদের বাড়িটা একতলা। মাঝখানে বড় বসবার ঘর, তার দুপাশে দুটো করে। পেছনে রান্নাঘরের লাগোয়া ছোট ছোট দু-তিনটে যা—ততদিনে ভোলাদার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোলাদা তো শুধু চাকর নয় এ বাড়ীর। বাড়ীর রক্ষক। আমার ও লোকাল গার্জেন। ওর স্ত্রী ক্ষান্তমণি বহুকাল এ সংসারের হেঁসেল ঠেলছে। ঐ ঘরগুলিতে ওরা সংসার সাজিয়েছে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে।

তবু একটা ঘর ছেড়ে দিতে হলো ওদের জনার্দন বেয়ারাকে। মিঃ সেনের খাস বেয়ারা—আপাততঃ মিসেস সেনের তদ্বির তদারক করবে এই মফস্বলে।

আর আমি পালিয়ে গেলাম সিঁড়িকোঠার ঘরে।

মিসেস সেন অবশ্যি বারবারই বললেন, এতগুলো ঘর আমাদের তো দরকার নেই। তুমি নিচেই থাকো যেমনটি ছিলে।

আমিই রাজী হই নি। এই এদের মধ্যে আমি বড্ড বেমানান। মিসেস সেনও ততটা নন যেমন কন্যা তিনটি—বব্ছাঁট, নখে ঠোটে রঙ ; সুর করে সু-শী-ই, সু-নি-ই ডাক,—এরা তিন বোন অন্য দলের বুঝিবা অন্য জগতেরও। ওরা আমার পড়শী নয়। আমিও তাই পালিয়ে গেলাম ওদের পাড়া থেকে।

বেঁচে থাক আমার সিঁড়ি কোঠার ঘর। আমার ভাবটা সেদিন যদিও মনে মনে তবু স্পষ্টতঃই বিদ্বেষের। বেয়ারাটিকে ভালই

লাগলো। ওরও বোধ হয় ভাল লেগেছিল, প্রথম দিনেই জনার্দনদা ডাক শুনে। নিচে, যে ঘরটায় আমি থাকতাম একটা টেবিল পেতে সেইটেই খাওয়ার ঘর তৈরি হলো। জনার্দনের পরামর্শে, ভোলাদা আর জনার্দন মিলে তাই করলো। তার আগে খাওয়ার পাট ছিল রান্নাঘরে। আমরা খেতাম পিঁড়িতে বসে। পালিয়ে পালিয়েই ফিরি। তবু দিনান্তে একবার মোলকাৎ হতোই রাত্রির ডিনারে—হ্যাঁ ওদের পাল্লায় পড়ে আমিও আজকাল ডিনারই খাচ্ছি।

সকাল বেলা পড়ার ছুঁতো করে চা-টা ওপরেই নেওয়াই। সারা দিন থাকি কলেজে—ইনটার্নমেণ্ট অর্ডারের জন্য চায়ের আসরে আর যাওয়ার উপায় নেই। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরি বাড়ি। রাত্রের খাওয়াটা তাই একসঙ্গে না খেলে অশোভন দেখায়। খাই একসঙ্গেই। আর এই মেলামেশার মধ্য দিয়েই খারাপ-লাগাটাও অনেকটা কমে এল। সুজাতার সঙ্গে তো বেশ ভাবই হয়ে গেল। মাঝে মাঝে আসে আমার সিঁড়ি কোঠায়। ধমকে বলে, বালিসের ওয়াড়টা বদলাতে পারো না? কি ময়লা, কি ময়লা—বড্ড নোংরা তুমি। অথবা, কাল না গুছিয়ে রাখলাম টেবিলটা আজই এই ছিরি করেছ তার? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

কোনদিন আমি বলি—আবার নখে রং মেখেছ? বেশ, তোমার সঙ্গে আড়ি।

—কেন, মাখলে কি হয়?

—আমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যায়।

—না কক্ষণো না—আমায় জড়িয়ে ধরে সুজাতা, বলে, আমি মানবোই না।

এমনি একটা অসমবয়সী বন্ধুত্ব আমার সুজাতার সঙ্গে।

সুনীতার মতামত আরো স্পষ্ট। বলে, আপনি বড্ড কুণো। আপনাকে একটুও পছন্দ নয় আমার।

সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হয় এক খাবার টেবিলে। খেতে বসে বই নিয়ে। খুব হাসির কথা হলে আঙুলের পত্রচিহ্নে বইটাকে মুড়ে

একবার তাকায় সবার দিকে, মৃদু হেসে আবার বইয়ে মন দেয়। এমনিতে ও কথা কমই বলে তবু মনে হয়েছে আমার বেলায় যেন অতি-সংযত।

একদিন মিসেস সেন বললেন, হাসতে হাসতেই বললেন—আমায় একটা বাড়ি দেখে দাও অমল, তোমার বাড়ি আর থাকবো না আমরা।

—কেন, কি করলাম আমি ?—হেসে আমিও জিজ্ঞেস করলাম। একটু থেমে আবার বললাম, অসুবিধা হচ্ছে কোন, এখানে ?

—হচ্ছে, আমাদের নয় তোমার।

—কে বললে ?

—সবাই, সুনু, সুজু—সুসিও তো বললে সেদিন। বললে, আমরা আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন নিচে থেকে সরে পড়ল, মনে হচ্ছে নেবার হিসেবে আমাদের ঠিক পছন্দ হয় নি ওঁর।

চাইলাম সুস্মিতার দিকে। আমার দিকেই তাকিয়েছিল ও। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল কোলের বইয়ে। বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখে বললে সুস্মিতা, আমি ঠিক অমন করে বলি নি কথাটা। তুমি মা সব গুলিয়ে ফেল। আমি বলছিলাম যে ঢাকায় এখন কতদিন থাকতে হবে তার তো ঠিক নেই। যদি অমলবাবুদের এ বাড়ীতে থাকতেই হয় ততদিন, তবে ওঁর সুবিধা-অসুবিধার কথাটাও ভাবা দরকার।

—তুই আবার সমস্ত ব্যাপারটাই এত সিরিয়স করে ফেললি যে—মিসেস সেন হাসলেন। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কিন্তু ঠাট্টা করেই বলেছিলাম কথাটা। তুমি যেন কিছু ভেবে বসো না।

—আমি কিছুই ভাবি নি, আসলে এসব নিয়ে যে ভাবতে হয়, ভাবা দরকার এটাই আমার জানা ছিল না। তাছাড়া এইবেলা বলেই রাখি যে আমার সুবিধা-অসুবিধার বালাই খুবই কম। আপনাদের যদি অসুবিধা না হয়, আমারও কক্ষণো হবে না। আর বলছি এইজন্যে যে এসব সামাজিকতার ব্যাপার-স্যাপারে

আমার বুদ্ধিটাও খেলে কম। এখন থেকে ওটা আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। আমাকে কখন কি করতে হবে শুধু বলবেন। —হেসেই উত্তর করলাম। তারপর সুস্মিতাকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনার অভিযোগগুলিও যথাসম্ভব আমাকেই বলবেন ভবিষ্যতে, মিছামিছি ওঁকে বিব্রত করেন কেন?

বইটা বন্ধ করে সুস্মিতা হাসলো। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাব্বারে আমি আপনার হয়ে বলতে গেলুম কিনা—

ওকে শেষ করতে না দিয়েই হেসে বললাম, বেশ তো এবার থেকে সেটা আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই বলবেন না হয়।

—না হয় আমাকে বল্‌বে, আমি ঠিক পৌঁছে দেব ওকে—বললে সুজাতা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় এমন একটা জাঁদরেল গার্জেন রয়েছে আমার—

হাসির মধ্যে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই আবার হাল্কা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে এলো একদিন সঞ্জীব।

জোরে কথা বলাটা সঞ্জীবের চিরকেলে অভ্যাস। এসেই চেঁচাতে লাগলো—অমল এই অমল। পর্দা-টর্দা টাঙ্গিয়ে এসব কি চেহারা করেছিস, বাড়িটাকে যে একেবারে বিয়ের কনে সাজিয়ে তুলেছিস।

আমি ওপর থেকেই শুনতে পেয়েছিলাম। নিচে নেমে এসে দেখি ড্রইং-রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব, আর ওদিকের একটা দরজায় কুতূহলী তিনবোন দাঁড়িয়ে।

সঞ্জীব একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেইদিকেই তাকিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—চীৎকার করছিস কেন?

সঙ্গে সঙ্গে এদিকে ঘুরে সঞ্জীব বললে—আরে ফাদার এরা কারা?

পর্দাটা টেনে দিয়ে ওরা তিন বোন সরে পড়ল। সুজাতার হাসিটাও অস্পষ্ট রইল না কিন্তু।

মোটামুটি ওদের পরিচয় দিলাম। শেষ পর্যন্ত শুনবার ধৈর্য নেই

ওর। আবার চীৎকার জুড়ে দিল, এই ভোলাদা, ভোলাদা একটু চা দিস আর ভাজাভুজি কিছু খাবার, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

সুজাতা পাশের ঘরে আবার হেসে উঠল, আর সুনীতারও গলা শুনতে পেলাম—বড্ড অসভ্য হয়েছে সুজু।

অনেকক্ষণ গল্প করলাম দুজনে অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে। মণি কলকাতা চলে গেছে, ভর্তিও হয়েছে ওখানে। আমি ইনটার্নড্। সঞ্জীব প্রায় ছিল না দিন পনের। কুমিল্লায় পিসিমার কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। আমি ওকে কল্যাণী-মণি ইতিবৃত্তও বললাম। শুনে সঞ্জীব বললে, এই কদিনে এত কাণ্ড।

ইদানীং ভোলাদাও খুব কেতাদুরস্ত হয়েছে। একেবারে টি টাইমে চায়ের টেবিলে আমাদের ডাকলো।

আমি ওদের আলাপ করিয়ে দিলাম—এ সঞ্জীব আমার বন্ধু, ইনি মিসেস সেন ; সুস্মিতা, সুনীতা, সুজাতা—আমার গার্জেন।

হাসির মধ্যে নমস্কার লেনদেনে পরিচয় হলো। এমন সময়ে ঘরে ঢুকল জনার্দন বেয়ারা। কাঁধে ঝাড়ন পরনে লম্বা উর্দি।

সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে বলল—তুমি কে বাবা ?

সবাই হেসে উঠল ওর বলবার ভঙ্গিতে, এমন কি জনার্দন নিজেও।

সুজাতা ছিল আমার পাশে। চুপি চুপি বললে, বেশ মজার লোক তো, তাই না ?

সঞ্জীব ততক্ষণে সুস্মিতাকে নিয়ে পড়েছে।

—কি পড়ছেন—এলিয়ট্ ?

'...আই হ্যাভ নোন্ দেম অল, দেম অল।

আই হ্যাভ সীন দি মর্নিংস, ইভনিংস এণ্ড আফটারনুনস

আই হ্যাভ মেজারড্ আউট অফ মাই লাইফ উইথ কফি-স্পুনস্।'

—অমলের ফেভারিট্ লাইনস্। কিন্তু এদিকে চা প্রায় ঠাণ্ডা।

খেতে লাগলো। মাঝে একবার বলল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল—সবাই চুপ। খাওয়া সেরে রুমালে হাত মুছতে মুছতে সঞ্জীব আবার বলল, খুকি, কপি ভাজাটা বেশ, না ?—লক্ষ্য সুজাতা।

—ধ্যেৎ, আমি খুকি নই—সুজাতার তৎক্ষণাৎ আপত্তি।

সঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। বলল, মাসীমা আজ যাই, একটু তাড়া আছে। মিসেস সেন হেসে ঘাড় নাড়লেন। সঞ্জীব আবার বললে, ওগো খুকি নই, চলি।—চলে গেল সঞ্জীব। এইটে ওর স্পেশালিটি। একবেলাতেই একেবারে মাসীমায় পৌঁছে গেল।

সঞ্জীব বেরিয়ে যেতে মিসেস সেন বললেন, বেশ ছেলেটি, বড় লাইভ্‌লি।

সুনীতা মন্তব্য করল—একটু গেঁয়ে গেঁয়ো কিন্তু।

সুনীতার উত্তরে আমি বললাম, এখানকার এই ঢাকার লোকদের কথায়, আচার-আচরণে একটু ডিসেন্সীর অভাব, এটিকেটে বিচ্যুতি মনে হবেই। কিন্তু ওরই মাঝে যদি খুঁজে নিতে পারো দেখবে একটা সূক্ষ্ম রসবোধ রয়েছে প্রতি কথায় প্রত্যেক কাজে। এই যে একটা রসিক মন, এর কাছে শালীনতাকে বিসর্জন দিয়েছে এরা এদের রসজ্ঞানের যুপকাঠে। ঢাকায় যদি কিছুদিন থাকোই, তো এটা মনে রেখো, দেখবে এদের কত সহজে গ্রহণ করা যায়।

—নিজেদেরই প্রশস্তি গাইছেন?—সুনীতা ভ্রূ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল।

বললাম—না, ঢাকার লোকেদের।

সুস্মিতা আমায় প্রশ্ন করলো—আপনি কি ঢাকার লোক নন।

বললাম, না, আমি গ্রামের ছেলে, সত্যিকারের গেঁয়ো। এটিকেট বলুন, ডিসেন্সী ডেকোরাম বলুন—বিসর্জনের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ও-সবে আমি অজ্ঞ। যেমন জানি না হোস্টের ডিউটি, কিংবা নেবারের প্রতি কর্তব্য।—আমি হাসলাম।

—আপনি বড্ড ঝগড়াটে।—হেসেই সুস্মিতা বললে।

—ওটাও এক ধরনের গেঁয়োমি।—হেসেই জবাব দিলাম আমিও।

—গ্রাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। আপনার কাছে যা তা শুনতে রাজী নই তাই বলে।—চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল সুস্মিতা। হাসতে হাসতেই চায়ের পাট সাঙ্গ করলাম সবাই

সেদিনের মত। যেতে যেতেই সুনীতা বললে, তবে এটা ঠিক, আপনার বন্ধু খুব ইনটারেস্টিং।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কি কমপ্লিমেণ্ট না গালাগালি ?

—যাস্ট এ স্টেটমেণ্ট অফ ফ্যাক্ট।

সুস্মিতা ততক্ষণে পাশের ঘরে পালিয়েছে।

বলতে গেলে একা একাই কাটাই। বাড়িতে ইনটার্নড্। কেবল কল্যাণী মাঝে মাঝে আসে। ওর সঙ্গে একটা নিরিবিলি স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমার। ও আমায় দাদা বলে, আমি ডাকি নাম ধরে। সূত্রটা উহ্য—মণি।

আসে, গল্প করে, মাঝে মাঝে য়ুনিভার্সিটি যাবার পথে ডেকে নিয়ে যায় ওর রিক্সায়। যুদ্ধের খবর জিজ্ঞেস করে। আমরা কি করবো, যদি যুদ্ধ বাধেই জানতে চায়। আর জানতে চায় মণির চিঠি এলো কি না।

মাঝে মাঝে আসে মণির চিঠি। ওকে পড়তে দি। আর দেখেছি চিঠিটা শেষ করেই কি এক অসহ্য ব্যথায় ও মনে মনে গুমরে মরে। সে চিঠির কোথাও কল্যাণীর কুশল জিজ্ঞাসা নেই—খবরটা পর্যন্ত জানতে চায় নি মণি।

আর আসে সমীর। রাত একটা-দেড়টায়। গেটে তালা দেওয়া থাকে। দেওয়াল টপকে এসে সিঁড়ি-কোঠার দরজায় টোকা মারে।

—অমল, এই অমল—?

—কে ?—ধড়মড় করে উঠে বসি।

বেচারা সমীর। সমস্ত ঝক্কিটা পড়েছে ওর ওপর। আমি ইনটার্নড্ মণি ভাগল্‌বা। ওকে একাই সামলাতে হচ্ছে সব। ক্লাস করা তো একরকম ছেড়েই দিয়েছে। দিতে হয়েছে বলেই। মাস-ভর সমস্ত জেলা টুর করে বেড়াচ্ছে। বলে, সব সয়। কিন্তু একটু আড্ডা মারার কেউ নেই—এইটা অসহ্য। অতএব আসে রাত

একটা, দেড়টা, দুটোয়। ঘণ্টা খানেক আড্ডা মেরে চলে যায়। কোন দিন বা কাজের কথা পাড়ে।

ভাল করে ভোর না হওয়া ভোর ভোর বেলা একদিন এলেন লাড়ুমামা। ভোলাদা ডেকে নিয়ে এলো আমার সিঁড়ি-কোঠার ঘরে। একটু ইতস্ততঃ করে লাড়ুমামা বললেন, রেভুল্যুসন কাকে বলে?

কে জানতে চায়, লাড়ুমামা? এ প্রশ্নটা মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখে বলি নি,—মুখে বললাম—যে পরিবর্তনটা আসে সিস্টেমেটিকেলি, পীসফুলি, সেটা হচ্ছে ইভোলিউশন্। এনিচেঞ্জ যেটা সেভাবে আসে না—সেইটেই রেভুলিউশন্—

হেসে লাড়ুমামা বললেন, জানলে কত সহজ।

আবার একটু ইতস্তত করে বললেন, এই যে তোমাদের পার্টি লাইন বা থিওরির ওপর বাংলায় কোন বই আছে? যা পড়ে মোটামুটি সব বোঝা যায়।

অবাক হয়েছিলাম। তবু কোন প্রশ্ন করি নি, কয়েকখানা বাংলা বই যা ছিল হাতের কাছে দিলাম ওকে। লাড়ুমামা চলে গেলেন।

আর একদিন—অভাবিত, সুস্মিতা হাজির হলো এসে। এই এত দিনের মধ্যে কোনদিন আসে নি ও আমার ঘরে। ওপরের এই সিঁড়ি-কোঠায়। অন্তত আমি তো জানি না। সেদিন এসে সুস্মিতা বললে, আপনার ঘরকন্নার কাজ দেখতে এলাম।

—এক কর্ণারেই তো পড়ে আছি আবার কেন পেছনে লাগলেন।

—আমি বুঝি শুধু পেছনে লাগতেই আসি?

—তবে?

—ভাব করতে নেই?

—সেটা তো আরো ভয়ের।

—বেশ, তবে করবো না ভাব।

—এবারে আদেশ করুন।

—আদেশও না, একটা কথা জানতে এসেছি। সত্য বলবেন তো?

পরিহাস-তরল হাসতে হাসতেই বলছিলাম, এতক্ষণ, দুজনেই।

এবারে একটু কঠিন হয়েই বললাম—মিথ্যা বলি না, বলে সত্যের অপলাপ করবো না। তবে নিষ্প্রয়োজনে কিংবা নিজের প্রয়োজনে মিথ্যা বলি না, এইটুকু বলতে পারি।

—আমি কিছু মীন করে বলি নি।

—তবে আসল বক্তব্যটা বলুন এবারে।—আবার হেসে বললাম আমি।

—না থাক।—সুস্মিতা উঠে দাঁড়ালো।

—যাবেন না। আমিও কিচ্ছু মনে করে বলি নি। বলুন কি কথা!

আমি হেসে আবার পূর্বেকার আবহাওয়াটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলাম। একটু ইতস্ততঃ করে সুস্মিতাও বলল অবশেষে।

—প্রায়ই অনেক রাতে আপনার কাছে কে আসে?

—কেন জানতে চাইছেন আগে তাই বলুন।

—দু-তিনদিন ঘুম ভেঙ্গে শুনেছি ছাদের ওপর কারা যেন পায়চারী করছে, কথা বলছে। ভয় হতো। পরে লক্ষ্য করেছি একজন আপনি। ভয়টা কেটেছে। কৌতূহল তার জায়গা নিয়েছে। কাল রাতেও আপনারা কথা বলছিলেন। জানি এটা অশোভন, তবু পা টিপে টিপে এলাম সিঁড়ি-ঘরের দোর পর্যন্ত। আপনি, আরো কে একজন ঘুরে ঘুরে পায়চারী করছিলেন ছাদে। সিগারেট খাচ্ছিলেন দুজনেই, মাঝে মাঝে আলাপও করছিলেন। কি আলাপ, অবিশ্যি বুঝি নি। ফিরে গেলাম। আর ঘুম হলো না। জিজ্ঞেস করে জানতে এলুম তাই। যদি আপত্তি থাকে বলবেন না।

—কাল আপনি যাকে দেখেছেন, সে সমীর, আমার বন্ধু। দিনের বেলায় লক্ষ্য করলে দেখবেন যে আমাদের বাড়ির সামনে একটা লোক সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। পুলিসের লোক—আমার বাড়ি কারা আসে তার খোঁজ নেওয়াই কাজ। তাই ওদের আসতে হয় এমনি রাতে দেওয়াল টপকে। কখনো বা জরুরী সংবাদ দিতে কখনো বা পরামর্শ করতে সংগঠনের কাজের। অথবা আসে গল্প করতেও।

—গল্প করতে? মাঝ রাতে?

—আপত্তি কি ?

—কষ্ট হয় না ? কখন ঘুমোয় ?

—কারো হয়, কারো বা হয় না। কাল তো সারারাত ঘুমোন নি, খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—একটু তো হচ্ছেই।

—একটা বৃহৎ আশার মুখ চেয়ে, এইসব একটু কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছি আমরা। গল্প না করলে, অর্থাৎ আড্ডা না মারলে যখন চলবেই না, মাঝ রাতেই মারো।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুস্মিতা। তারপরে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আমি কি ভেবেছিলাম জানেন ?

—না বললে জানবো কি করে ?

—ভেবেছিলাম বোধহয় কল্যাণী।

হেসে জবাব করলাম—আপনি তা ভাবেন নি। গেটে তালা দেওয়া থাকে। রাত দুটোয় দেওয়াল টপকে কোনো মেয়ে গল্প করতে আসে না। তেমন দরকার হলে আমিই যেতাম।

—তবে যান না কেন ?

—বললাম তো তেমন দরকার হলে, যেতাম। আসলে আপনি যেটা ভুল করেছেন সেটা হচ্ছে আমার সঙ্গে কল্যাণীর সম্পর্কটা। আর—একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললাম—যাচাই করতে যখন শুরুই করেছেন, তখন মনের আয়নায় নিজের ছবিটা আগে যাচাই করে নেবেন। আপনার ভালোর জন্যই বলছি।—এবারেও হেসেই বললাম কথাগুলি।

একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সুস্মিতা, জানালায় দৃষ্টিটাকে তুলে ধরে। তারপর কিছুই আর না বলে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

আর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম আমি। সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে আঙুলের ডগায় সেঁকা দিতে সম্বিত ফিরে এল। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা নতুন সিগারেট ধরালাম।

য়ুনিভার্সিটির লনে বসে ওরা আড্ডায় মস্‌গুল। অশোক, চিত্ত, সমীর, সমর, মঞ্জু। বিন্দুসারও রয়েছে। সমীরকে ইশারায় ডেকে বললাম, তোর কি বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে সব? বিন্দুটাকে নিয়ে আড্ডা মারছিস যে বড়।

—ও আসে, কি করে বলবো যে, চলে যা।

—আমি লাইব্রেরীতে আছি পাঠিয়ে দে ওকে।

এলো বিন্দুসার একটু পরেই।

বুঝিয়ে বললাম ওকে—দ্যাখ বিন্দু, তোদের বাড়িটা হচ্ছে আমাদের ফোর্ট। কত গোপন কাগজ-পত্র রয়েছে তোদের বাড়ি। তাছাড়া দরকার হলে কখন কাকে যে অ্যাবস্কণ্ড করতে হবে! প্রথম আশ্রয় তোদের বাড়ি, এ তুই ভুলে যাস্ কেন। ঐ চিত্ত, সমীর, অশোক—সবগুলো দাগীর সঙ্গে আড্ডা মারছিস যে বড়, যদি তোকে সন্দেহ করে, যদি তোর বাড়ি সার্চ করে? তোকে কিছুতেই এক্সপোজড্ হতে দেওয়া চলে না। এ তুই বুঝিস না কেন? এবারে কেটে পড়। আমার সঙ্গেও বেশীক্ষণ একসঙ্গে থাকা ঠিক নয়।

চলে গেল বিন্দু, একটু রেগেই গেল বোধ হয়। কিন্তু আমি নাচার। দাদাদের কঠিন নির্দেশ যেন এক্ষুণি বিন্দুকে কোন কাজে জড়িয়ে এক্সপোজ না করি।

পুরুষানুক্রমে মদ আর লাম্পট্য করেছেন মহাভারত সা। পুরুষানুক্রমে সরকারের হাত-ধরা। এইটেরই সুযোগ নিতে হবে। সেই কুলে বিন্দুসারের মত ব্যতিক্রম আছে, এইটে জানতে দেওয়া চলবে না।

মহাভারত জাত লম্পট। সাত সাতটি মেয়েমানুষ ছিল মহাভারতের রক্ষিতা। তাদের বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, ছিল দাস-দাসী। মহাভারতের টাকায়। এইতো সেদিনও দেখলাম বিকৃত-মস্তিষ্ক মহাভারত আজও তাদের ভুলতে পারেন নি। তারা সবাই

হয়তো আজ বেঁচেও নেই। বারনারী হওয়ার জন্য দেহের যে বয়স দরকার, নিঃসন্দেহে সবাইকারই সে বয়স আজ পেরিয়েছে। তবু মহাভারত আজও সারবন্দি তাদের দাঁড় করিয়ে রাখেন—অবশ্যি মনে মনে। উলঙ্গ করে নিতম্বের মাপ নেন, বলেন, সর্বোত্তমা জাহ্নবী।—জাত-লম্পট আর কাকে বলব? দলের দাদারা বলেন ওইটাকেই কাজে লাগাতে হবে। এইসব বিগতযৌবনা বেশ্যাদের বাড়িতেই হবে আমাদের আস্তানা। পুলিসের সাধ্য কি খুঁজে বের করে? আর বিন্দুসারকে এই কাজেই লাগাতে হবে। ওকে এক্সপোজ করা চলে না।

বিন্দুসারের কাছে আমারই কথা পাড়বার কথা। কিন্তু আমি আজও বলতে পারি নি ওকে।

বিন্দুসার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বিন্দুসার যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। শুনেছিলাম, এর কৃতিত্ব বিন্দুর মায়ের।

সেই যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম বিন্দুসারের বাড়ি, যেদিন বিন্দুসার আমার সামনেই বিকৃত-মস্তিষ্ক পিতাকে বিকৃততর রুচিতে গালাগাল করেছিল, তার কদিন পরেই বিন্দুসার আমায় বলেছিল। একদিন আমায় ডেকে নিয়ে গেল কবর খানায়। ঐখানটা বড়ই নিরিবিলি। আর সেই নিরিবিলি কবর-খানায় বসে বিন্দুসার বলেছিল ওর মৃত মায়ের কাহিনী। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান মন্দাকিনী, আমরা তাই জানতাম। বিন্দুসার বলেছিল, না। আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি।—

—কেন?

বিন্দুসার বলেছিল—

আশ্চর্য রূপসী ছিলেন তিনি। লাখে এক মিলে কি মিলে না, এমন রূপ।

মন্দাকিনী নাকি বিদুষীও ছিলেন, সেকালে ঐ সমাজে দুর্লভ এমনই বিদ্যার অধিকারিণী। কিন্তু মহাভারত রূপ চান নি, বিদ্যা চান নি, চেয়েছিলেন রঙ্গ, রঙ।

সেই রঙের খেলায়ও একদিন বশীভূত করেছিলেন মহাভারতকে বিন্দুর মা মন্দাকিনী। আর মহাভারতের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন—একটি পুরো মাস। সময় কি কেউ কিনতে পারে? সময়কে কি কেনা যায়? মন্দাকিনী কিনেছিলেন কিন্তু। একশ টাকার নগদ বিনিময়ে মহাভারতের পুরো একমাস।

দিনটা ছিল পৌষ সংক্রান্তি। হাজার হাজার ঘুড়িতে আকাশে তিল ধারণের জায়গা নেই। মন্দাকিনী ছাদের আলিশায় হেলান দিয়ে তাই দেখছিলেন। অদৃশ্য সুতোর বাঁধনে বাঁধা-পড়া ঘুড়িগুলির সঙ্গে কোথায় যেন একটা একতা বোধ করছিলেন—কিন্তু ঠিক কোথায়? একটা গণ্ডগোল শুনে নিচের দিকে তাকালেন তিনি। শ'য়ে শ'য়ে লোক ছুটে যাচ্ছে। কারো হাতে মস্ত লগি, কারো হাত খালি, কারো কারো লগির মাথায় কাঁটাকুলের ডাল-পালা বাঁধা। সবার মুখেই মহাভারতের নাম। চিৎকারের মধ্যে উত্তেজনার অভিব্যক্তি চরমে উঠেছে।

একটা চাকরকে ডেকে মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার রে?

ভৃত্য মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। মন্দাকিনী ভয়ই পেয়েছিলেন প্রথমটা। অনেক জিজ্ঞাসা-বাদের পরে ভৃত্য শুধু বললো—ভয়ের কিছু নেই মা।

তারপর অনেক প্রশ্ন, অনেক জেরা, অনেক বখশীস কবুল করে সবই শুনলেন—সবই জানলেন মন্দাকিনী।

বেশ্যা বাড়ির ছাদে বসে পৌষ-পরবের ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন মহাভারত। প্রত্যেক ঘুড়ির সঙ্গে দশ টাকার নোট বাঁধা। আবার কোন কোনটায় মহাভারতের স্বহস্তের স্বাক্ষরে লেখা রয়েছে, আজই রাতের মধ্যে যে রমণী ঐ নোট মহাভারতকে প্রত্যর্পণ করতে পারবে, তাকে অনুরূপ দশখানা দশ টাকার নোট দেওয়া হবে।

সেই ঘুড়ি কাটা পড়েছে। অতএব লগির মাথায় কুলগাছের কাঁটা এঁটে, অথবা আঠা সেঁটে শ' শ' লোক দৌড়ুচ্ছে—যদি

মহাভারতের কাটা ঘুড়ির সুতোটা কোন রকমে লুটতে পায়। সেই সব নোট আবার চড়াদামে কিনে নিত দালালরা, গুণ্ডারা। সন্ধ্যার পর তাকে তাকে থাকতো বেশ্যাপট্টিতে। আর গভীর রাতে দশ টাকার কারেন্সী নোট দশগুণ হয়ে ফিরে যেত রকমারী বখরায়— দালালরা, গুণ্ডারা, বেশ্যারা।

বিশ্বস্ত চাকর বিশ্বম্ভর। এক বাণ্ডিল নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে মন্দাকিনী বললেন—বিশু, যে করেই হোক ঐ একটা নোট আজ্ আমার চাই-ই চাই। এই তোর বখশীস।

এক বন্ধু বলেছিলেন, জানিস্, টাকা ওড়ে। ওটা টাকার স্বভাব। কিন্তু শালারা কোন দিক দিয়ে উড়ে যায় বলতে পারিস্? সারা গায়ে আঠা মেখে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

কিন্তু ঐ ওড়া পর্যন্ত, আঠা সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলেই গায়ে এসে আটকে যাবে এমন বিশ্বাস আমার নেই। টাকা ওড়ে, বিদগ্ধজন, বোধ হয় সত্য কথাই বলেছিলেন। টাকা ওড়ে। টাকা উড়ছে। আর উড়তে উড়তে একটা নোট শেষ পর্যন্ত মন্দাকিনীর হাতেও এসে পড়লো—কয়েক শ' টাকার খেসারৎ মূল্যে।

মনোযোগ দিয়ে পড়লেন মন্দাকিনী ঃ

যে রমণী অদ্যই রজনীতে এই নোট আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে, তাহাকে অনুরূপ দশখানা দশ টাকার নোট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য রহিলাম।—মহাভারত সাহা।

আবার পড়লেন মন্দাকিনী—একবার, দুবার, আবার, আবার।

আজই রাতের মধ্যে? হ্যাঁ, আজই রাতের মধ্যেই।—মনে মনে একটা কঠিন সংকল্পকে রূপ দিতে দিতে অস্বাভাবিক চিৎকারে মন্দাকিনী ডাকলেন—বিশ্বম্ভর আমার গাড়ি জুড়তে বল্।

—বেলা তখন পড়ে এসেছে। সন্ধ্যা হয় হয়।

সুস্মিতা সেই থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আর এড়ানোটা কঠিন নয় তো। আমি সারাদিন কাটাই ওপরের ঘরে, সিঁড়ি কোঠায়। একবার নেমে যেদিন যাবার য়ুনিভার্সিটি যাই। ব্যস্।

ওদের সঙ্গে সম্পর্ক এক রাত্রিতে। খাবার টেবিলে। লক্ষ্য করলাম কদিনই সুস্মিতা নেই টেবিলে। নেই কেন? এ অবশ্য জিজ্ঞেস করি নি। তাছাড়া মাথা ধরা আছে, এখনো ক্ষিদে পায় নি আছে, কিংবা ক্ষিদের তাড়ায় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম—এড়াবার ইচ্ছা থাকলে কত কিই তো বলা চলে। কাজটা কোনো কঠিন নয়। এড়িয়েই চলছে সুস্মিতা। যদি বা কোনদিন খাওয়ার টেবিলে থাকেও, একটা বইয়ের পাতায় মাথাটা নুইয়ে রাখে সুস্মিতা, সে মাথা তুলবে আমি টেবিল থেকে উঠে গেলে তবেই। আবার কোনদিন বা খাওয়ার পরে আমি যদি আড্ডা জমাই সুজু সুনুর সঙ্গে, তো হঠাৎ—এক্স্কিউজ মি, ঘুম পাচ্ছে—বলে বইটা মুড়ে উঠে পড়ে। এড়িয়ে যে চলছে এটা ঠিক। কিন্তু কেন? লজ্জা? অভিমান? এক একবার মনে হয়েছে ডেকে জিজ্ঞেস করি। আবার ভেবেছি, থাক কিই বা দরকার। দরকারটা আমার মনের কাছে তখনো এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি সেদিনও।

সুজাতা ইদানীং নিয়মিত আমার তদ্বির তদারক করছে। টেবিলের বই গুছিয়ে রাখা। সকালবেলা এসে জানালা খুলে দিয়ে লাইটটা নিবিয়ে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা গার্জেনোচিত ধমক-ধামক। কখনো বলে, বেজায় কুণো তুমি। সিগারেটের খালি বাক্স আর ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে, আমাকে নিয়ে যে আর পারা যায় না, তাই শোনায়—বেশ লাগে। ওর সঙ্গে আমার অসমবয়সী বন্ধুত্ব। আমার ভালো লাগে না বলে ও আর ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে না। নখ নেল-পালিসের নকল রক্তে রক্তাক্ত করে তোলে না। আমার ভালো লাগে বলেই সুনীতাকে সুনুদি বলে ডাকে। 'সু-উ-উ নি-ই-ই' বলে সুর করে ডাকে না আর।

এ ব্যাপারে সুনীতার বিদ্রোহটা স্পষ্ট। বলে, কি যে করছেন আপনি অমলদা। সুনুটাকে একেবারে গেঁয়ো বানিয়ে ছাড়লেন। কোলকাতা গিয়ে ওর মুখ দেখানো দায় হবে।

খুব বিচলিত হবার ভান করে বলি, তবে তো সর্বনাশ।

—না ঠাট্টার কথা নয় এটা। সিরিয়সলি বলছি।

—আমিও তো তাই।

—ধ্যেৎ, ভালো লাগে না এসব রসিকতা।—বলে রণে ভঙ্গ দেয়।

এ নিয়ে সুজাতার সঙ্গেও ওর নিত্য ঝগড়া। কোনদিন ও জেতে কোনদিন বা সুজাতা। মিসেস সেন বিচক্ষণ জজ, তাঁর আদালতে কারু পক্ষেই একতরফা রায় নেই। এরই মধ্যে একদিন ঘর গোছাতে এসে সুজাতা খবর দিলে, জানেন অমলদা, দিদিও আমাদের দলে।

বললাম, আবার দলাদলিটা কিসের ?

—দেখছেন না দিদিও আজকাল রঙ মাখে না নখে, ঠোঁটে। বললে কিনা, তোমার বন্ধুর বাড়িতে আছি সুজু। না-ই বা মাখলাম ওগুলো, যখন ওঁর পছন্দ নয়। যা মেজাজ, রাতবিরেতে যদি একদিন তাড়িয়েই দেয়। এই বিদেশে বিভূঁয়ে তখন কোথা গিয়ে দাঁড়াবো ? তার চেয়ে না হয় একটু মন-রেখেই চলি।

আমি উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। তবু নিস্পৃহ সুরে বললাম, তা তুমি কি বললে ?

—আমি অবিশ্যি ওকে সে ভয় পেতে মানা করেছি। অমলদা অত খারাপ হতেই পারে না। তাড়িয়ে দেবে না কক্ষণো। তবে ওগুলো মেখেই বা কি হয় ? তাই না ! ঠিক বলি নি ?

—তারপর দিদি কি বললে ?—জিজ্ঞেস করি আমি।

—আর কি বলবে ? তবে আমাদের দলে, এটা ঠিক।—আমায় নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করে সুজাতা নিশ্চিত আশ্বাসের ভঙ্গিতে। কিন্তু আমার মনে সুর কেটে যায়। যেন আরও কিছু শুনতে চাই। বেশ জমে উঠেছিল, যেন একমন গান। হঠাৎ তালভঙ্গের খুঁতখুঁতানিতে ভরে দিল।

আর সেইটে ভাবতে গিয়েই নিজের কাছেও ধরা পড়ে গেলাম। নিজের মনের কাছে। অজ্ঞাতেই কখন সুস্মিতা সম্পর্কে অতি-উৎসুক হয়ে উঠেছি। সুস্মিতা কি ভালোবাসে আমায়? কেউ আমায় ভালোবাসে, এতো যে ভালো লাগে ভাবতে। এ আগে জানতাম না। মনেই হয় নি। সুস্মিতা আমায় ভালোবাসে—কি যে ভালো লাগছে ভাবতে। আবার তক্ষুণি আর একটা মন শাসন করেছে, ছিঃ কি ভাবছি! একি ইতরামো? পরক্ষণেই মনে হয়েছে ইতরামোটা কোথায়? আজব এই মন!

মহাভারত বলেছিলেন. স্ত্রী-চরিত্র বোঝা বড় দায়। শুধুই স্ত্রীলোকের মন? নিজেকেই কতটুকু বুঝতে পারে মানুষ? মহাভারত পেরেছিলেন? সেটাই আরো কঠিন তো।

এই আমি। আজ ভাবছি, ভাবতে কত না ভালো লাগছে, সুস্মিতা আমায় ভালোবাসে। অথচ কদিন আগেও ওর ওপর ছিল কত না বিতৃষ্ণা! এ্যাংলিসাইজড্, স্নব—কত কি না ভেবেছি। সত্যি কি ভালোবাসে সুস্মিতা? তাই বা নিঃসংশয় হয়েছি কই। এমনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যে-সন্ধ্যে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

ঠিক ঘুমও নয়। এমন হয়। কিছু ভাবতে ভাবতে ভাবতে—তখন আর আমি নই, তুমি নও, ভাবনাটাই আমাকে-তোমাকে নিয়ে খেলতে থাকে। চোখ ভেঙ্গে ঘুম নেমে আসবে। তবু ঠিক ঘুমও নয়! কেমন ঘুম-ঘুম আচ্ছন্ন ভাব একটা। আর সম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন। এমনি ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যেই মনে হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল যেন সব জানাজানি হয়ে গেছে। আমি সুস্মিতায় আসক্ত। মিসেস সেনের হাসি-হাসি মুখখানা কেমন থমথমে কঠিন হয়ে উঠেছে। মিস্টার সেনকে কোনদিন দেখি নি। শুধু শুনে শুনে মনে মনে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছিলাম এতদিন। স্বপ্নের রাজ্যে অস্পষ্ট আবছা আজ তাঁকেও দেখলাম। দাঁতে পাইপটাকে আঁকড়ে ধরে স্পষ্ট ঋজুতায় দাঁড়িয়ে—যেন এক্ষুণি শাসন চাই। মিসেস সেন যদি কঠিন হয়ে

থাকেন তবে মিস্টার সেন কঠিনতর। আর কি করে জানি না শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত কলেবরে বাবার কানেও উঠেছে কথাটা। তাঁর বক্তব্য আরো পরিষ্কার।—চরিত্র বলিয়া যাহাদের কিছু নাই, তাহাদের আর রহিল কি ? তাহাদের বাঁচিয়াই বা মহৎ কোন লাভ। আর বাঁচিয়া থাকিলেও তিনি অন্তত তাহাকে পুত্রের সম্মান দিতে রাজী নন। আমি কুলাঙ্গার। অতএব আজ হইতে তাঁহার কাছে মৃতবৎ।

এই সময়েই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সব স্বপ্ন তবে। প্রথমেই যা মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, ভাগ্যিস সত্যি নয়! আর পরক্ষণেই মনে হলো যেন সত্যি না হয়ে একটা চান্স পেয়েছি। আর ভুল নয়। মানুষ পরিবেশের দাস। আমি যে পরিবেশে মানুষ ; প্রেম করে ধরা পড়লে, এ-ই তার পরিণতি। স্বপ্নটা যেন ওয়ার্নিং দিয়ে গেল। অতএব আর ভুল করলাম না।

খাওয়ার টেবিলে বসে সুস্মিতা কখন মুখ তুলবে তার প্রতীক্ষায় থাকি না আর। বরং আমিই মুখগুঁজে খেয়ে নিয়ে পালাই। মাঝে মাঝে সকালের চায়ে নিচে নামতাম। একেবারেই বন্ধ করলাম সেটা। এমন কি একদিন বিকেলে যখন সুস্মিতার নিমন্ত্রণ নিয়ে এলো সুজাতা, বললে—মা আর সুনুদি বেড়াতে গেছেন, দিদি বললে আপনাকে নিচে যেতে। গল্প করবে।—তাও প্রত্যাখ্যান করলাম। সুজাতাকে বলতে বললাম যে, সময় নেই আমার—বড্ড কাজে ব্যস্ত।

বলে পাঠালাম আর দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছিলাম—হয়ত এক্ষুণি উঠে আসবে সুস্মিতা। বলবে, কি অত কাজ ? তখন কি বলব ? আশা আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করেছিলাম। সেদিন আসে নি কিন্তু সুস্মিতা। এসেছিল দিন কয়েক পরে। সন্ধ্যাবেলা। বসেছিলাম আমি, আমার সিঁড়ি-কোঠার ঘরে। দৌড়ে ঢুকল সুস্মিতা। বললে, আমায় কল্যাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন ?

ঠিক বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে রইলাম উৎসুক দৃষ্টিতে। সুস্মিতাই স্পষ্ট করে বললে ব্যাপারটা। কল্যাণী আসছে। ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায় সুস্মিতা।

—নিশ্চয় আলাপ করিয়ে দেবেন কিন্তু।

—বলে একটা মোড়া টেনে বসল।

আশ্চর্য মেয়েমানুষের মন। সেদিনের পরেও যে স্থস্মিতা আসবে, আবার যেচে আলাপ করবে আমার সঙ্গে, এমন ভাবিও নি।

প্রথমে একটা মোড়া টেনে বসেছিল স্থস্মিতা। পরে উঠে গিয়ে টেবিলটা গোছাতে লাগল। কল্যাণী ঢুকল একটু বাদে। ও যে আসছে দূরে থাকতেই স্থস্মিতা দেখে এসেছিল। ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিলাম। প্রথম পরিচয়ের আলাপচারী সেরে স্থস্মিতা বললে, বস্থন আপনারা, আমি চা বলে আসি।

কল্যাণী এ স্থযোগ ছাড়লো না। বললে, ঘর গুছোবার বেশ লোক জুটেছে তো অমলদা। ভালোই আছ মনে হচ্ছে।

কল্যাণীর অনুযোগে কি জানি কেন স্থস্মিতারই পক্ষ নিয়েছিলাম সেদিন। কি বিপদ যে ডেকে এনেছিলাম টের পেলাম একটু পরেই।

বলেছিলাম—তোমার যেন খুবই আপত্তি!

—মোটেই না। বলছিলাম যে তবে আর দগ্ধে মারছো কেন মেয়েটাকে।

—তার মানে?

—আমি যে কোনদিনই তোমার ঘর গুছোতে আসবো না এইটে বলে বেচারাকে নিশ্চিন্ত করলেই পারো।

কল্যাণী বুদ্ধিমতী। কিছুই ওর চোখ এড়ায় নি। আবার হেসে বলল, আমার ওপর ওর ভীষণ রাগ। জানে না সেটা অযথাই।

একটু এম্‌ব্যারাস্‌ড ফিল করছিলাম। তবু হেসেই বললাম—অভয় যদি দিতেই হয়, তুমিই বলো না হয়।

—দেবোই তো অভয়, বললে কল্যাণী—দেখে নিও তুমি। শুধু তোমার মনটাই জানতে যা বাকি ছিল। সেটাও স্পষ্ট হলো আজ।

—একেবারে স্পষ্ট হয়েছে বুঝি?

—একেবারে। স্বচ্ছ কাচের মত।—হেসে উঠল কল্যাণী।

আর এই সময়ে উঠে এল সুস্মিতা। চায়ের ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে বললে, হাসছেন যে অত।

কল্যাণী বললে—অমলদাকে একটা হাসির গল্প বলছিলাম।

—কি গল্প? বলুন না, শুনি।

—শুনবেন, শুনুন তবে। রেলগাড়ির কামরায় লেখা থাকে দেখেছেন, চোর জুয়াচোর নিকটেই আছে। আপন আপন মালের ওপর নজর রাখ। জীবনের রেলগাড়ি তো এমন নিত্যই ছুটেছে। অদৃশ্য আঁচড়ে লেখা এই মুহূর্তের কামরায় একজনের ধরুণ এ লেখা চোখে অর্থাৎ মনের চোখে পড়েছে। সে তার সম্পত্তি আগলাতে ছুটে এলো। হাসির কথা নয়! বলুন?

ইঙ্গিতটা বোধ হয় সুস্মিতা বুঝেছিল, গম্ভীর হয়ে তাই জবাব করল—আগলানোই তো উচিত। এ এমন কি হাসির কথা?

উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে কল্যাণী বলল, তবু হাসবে না ভাই? গম্ভীর হয়েই থাকবে! তবে বলেই ফেলি।—উঠে গিয়ে সুস্মিতাকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, আমি চোরও নই, জুয়াচোরও নই। বোনাফাইড ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জার।

সমস্ত ব্যাপারটাই অকল্পনীয়। কিন্তু এরপর সুস্মিতা যা করল সেটা আরও অভাবনীয়।

একটুক্ষণ চুপ করেছিল সুস্মিতা। একঝলক রক্ত রাঙিয়ে দিয়ে ছিল ওর সমস্ত মুখ সেই একটুক্ষণের জন্য। তারপরেই সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে পাণ্ডুর হয়ে গেল। কল্যাণীর চোখে চোখ রেখে সুস্মিতা তিক্ত স্বরে বলল, কারো দুর্বলতাকে নিয়ে পরিহাস করার মধ্যে রুচির পরিচয় নেই কোন।—বলেই আর দাঁড়ালো না। একেবারে একতলায় নেমে গেল।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান।

কল্যাণীর অনুরোধ শোনে নি সুস্মিতা। আর দাঁড়ায় নি।

কিন্তু কল্যাণী কল্যাণীই। সুস্মিতা যখন দাঁড়াল না, কল্যাণীই

ওর পিছুপিছু তরতর করে নেমে গেল। হাতের ইসারায় আমায়ও অভয় দিয়ে গেল ওরই মধ্যে, যেন নিশ্চিন্ত থাকি। নিশ্চিন্ত হয়েই বসে রইলাম।

বসেছেন সপারিষদ মহাভারত সা। আসছে একের পর এক বারাঙ্গনারা। ফিরে আসছে তাদের হাতের পণবদ্ধ দশটাকার নোটগুলি। আবার দশগুণ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। টাকা ওড়ে। টাকা উড়ছে।

সহসা চকিত হলো মহাভারতের মদির আঁখি। কে এই মদিরে-ক্ষণা?

পারিষদরা দেখলো, এত রূপ? কে এই উর্ব্বশীশ্রেষ্ঠা? কখনো তো দেখি নি একে।—কে, কে, তুমি?

অঙ্গীকার-বদ্ধ একখানা দশটাকার নোট নামিয়ে রেখে জোড়-করে দাঁড়ালো রমণী মহাভারতের সামনে। বলল—আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হোক, এ বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু প্রতিবেশে আমি দান গ্রহণ করি না। তাই আপনাকে একবার আসতে হবে আমার আলয়ে।

—কে তুমি? কোথায় ঘর তোমার?—সহস্র প্রশ্ন পারিষদজনের। রমণী নিরুত্তর। জোড়-করে মহাভারতের সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। দুই বিন্দু অশ্রু। যেন দুটি অস্থির মুক্তা বিন্দু নেমে আসছে স্থির গাল বেয়ে।

বিহ্বল মহাভারত। স্থির চোখে চেয়েছিলেন বিহ্বল মহাভারতও। ভেবেছিলেন, এ কি স্বপ্ন? ভেবেছিলেন, এও কি সম্ভব? আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে এসে হাত ধরলেন।

—চলো, কোথায় নিয়ে যাবে?

আর তক্ষুণি কাঁপতে কাঁপতে মন্দাকিনীর অচৈতন্য শরীরটা ঢলে পড়লো মহাভারতের বুকে।

বন্ধু-বান্ধব পারিষদ-মহলে ঢি-ঢি পড়ে গেল। সব জানাজানি হয়ে গেল। —ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘরের বউ তুই—সা-বাড়ির বউ—কুলবধূ, তোর এই কাজ? আর মহাভারতটাই বা কি? দে মাগীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে। মার দুই লাথ, বল ভাগো হিঁয়াসে, তারপর চলে আয় যেমনটি ছিলি। হুঁঃ।

কিন্তু হুঁ-হাঁতে কিছু হল না। মহাভারত নির্বিকার। একমাস বাড়ি থেকে বেরুলেন না। একমাস মদ স্পর্শ করলেন না। একমাস মন্দাকিনী যা বলেছেন তাই করেছেন, তাই শুনেছেন। একশত টাকার নগদ বিনিময়ে কিনে নেওয়া একটি মাস। সময় কি কেউ কিনতে পারে? সময়কে কি কেনা যায়? তবু মন্দাকিনী কিনে ছিলেন। দশটাকার দশগুণিত একশ টাকার নগদ মূল্যে। একশ টাকার দাম মহাভারতের কাছে এক মিনিটও নয়। দশ টাকার দামও তো দশটাকাই। তবু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাই দশগুণ বেড়ে হয় শত টাকা। সময়ের মূল্যে একশত টাকার দাম মহাভারতের কাছে হয়ত কয়েক মিনিটও নয়। কিন্তু মন্দাকিনী কিনে নিলেন একটি মাস।

আর এই পুরো একমাস মহাভারত মদ স্পর্শ করেন নি। একমাস বাড়ি থেকে বেরোন নি। পারিষদদের বিদায় দিয়েছেন অবহেলে, প্রলোভনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন নির্মম পরিহাসে। মন্দাকিনী যা বলেছেন তাই শুনেছেন, তাই করেছেন। হয়তো মহাভারত ভেবেছিলেন, আমি রঙবাজ মহাভারত সা।, যে আমার চোখকেও ধাঁধিয়ে দেয় তার মূল্য দিতে হবে বই কি। দিয়েছিলেন মহাভারত। কিন্তু একটি মাসই শুধু, তারপরে আবার যে-কে সেই।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একমাসের শেষ রাত্রি ভোর হলো। মন্দাকিনী এসে দেখলেন মহাভারত বিছানায় বসেই মদ খাচ্ছেন। আর মন্দাকিনীকে দেখেই মহাভারত বললেন—উঃ একটা মাস। গলা শুকিয়ে একেবারে খটখট করছিল—বলেই বোতলটা উজাড় করে ঢেলে দিলেন গলায়।

মন্দাকিনী দেখলেন যেন ওঁর সমস্ত আশার পাত্রটাকে উপুড় করে ঢেলে ফেলে দিচ্ছে।

এগিয়ে এসে বললেন—আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকলো। তুমি ফিরে যাও তোমার পুরনো পৃথিবীতে। তবু যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও। আজ থেকে আমার নূতন ব্রত শুরু। আমার যদি ছেলে হয়, তবে জেনো তার ঘৃণার আগুনে একদিন তোমাকে পুড়ে মরতে হবে। তাকে আমি শেখাবো ঘৃণা করা কাকে বলে। আর যদি আমার মেয়ে হয় তবে জেনো যে ঘরে বসে তুমি আজ মদ খেলে এইখানেই বসবে একদিন এ শহরের সেরা বাঈজীর মাইফেলের আসর। লম্পট মাতাল মহাভারতের কন্যা হবে শহরের সবসেরা নর্তকী।

আশা-ভঙ্গের ক্ষোভ মানুষকে পাগল করতে পারে। মন্দাকিনীও কি পাগল হয়েছিলেন সেদিন? আর মহাভারত সা? গালে হাত রেখে মহাভারত শুনেছিলেন। মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন, তারপর বললেন, তবে আজ থেকেই জানতে থাক।---জানতে লাগল। জেনেছিল শহরের লোক মহাভারত এবার থেকে বাড়িতেই রঙের হাট বসালেন।

তিন মহলা সা-বাড়ির মাঝখান দিয়ে একটা পাঁচিল উঠল। ব্যবধানের পাঁচিল মহাভারতে মন্দাকিনীতে। প্রাচীরের এপাশে হুল্লোড় যত বাড়লো ওপাশের সংকল্প ততই অটুট হলো। তারও প্রায় এক বছর পর জন্ম হলো বিন্দুসারের। আর মন্দাকিনী অবিচল নিষ্ঠায় তৈরি করতে লাগলেন ওকে।

সহসা সেই ছবিটা ভেসে উঠলো মনের পর্দায়।…লম্পট মাতাল কোথাকার! লজ্জা করে না মানুষকে মুখ দেখাতে? যাও—ওপরে যাও…

স্মৃতির পর্দায় বিন্দুসারের চেহারাটা রন্ রন্ করে বাজতে লাগলো। মন্দাকিনীর সফলকীর্তি, সার্থক-পুত্র বিন্দুসার।

সব শোনার পরে বিন্দুসারের ওপরও রাগটা যেন আর নেই।

য়ুনিভার্সিটি যাবার রাস্তায় হঠাৎ একটা দেওয়ালের লেখার দিকে দৃষ্টিটা থমকে থামলো। শরদিন্দু ব্যারিস্টর + অঞ্জলি বসু। দুইজনের মাঝখানে একটা যোগ চিহ্নের সাহায্যে পরস্পরের যোগাযোগটা জনসাধারণে বিজ্ঞাপিত করেছে যেন কে বা কারা। যেতে যেতেই দেখলাম শুধু একটা দেওয়ালেই নয় শহরময় দেওয়াল জুড়ে এক যোগ চিহ্নের ব্যবধানে এই দুই নামের নির্লজ্জ বিজ্ঞপ্তি। তা ছাড়া এও মনে হলো আমাদের অঞ্জলি নয় তো? শরদিন্দু নামটাও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন। সেই যে শরদিন্দু আর সেই আশ্চর্য চোখের একটি মেয়ে—কি যেন নাম! কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার তখনো বাকি ছিল আমার। য়ুনিভার্সিটি পৌঁছতেই সমীর বললে, কল্যাণী তোর খোঁজ করেছিল, বড্ড নাকি জরুরী দরকার।—সেই সেদিনের পরে কল্যাণীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। সুস্মিতা আমাকে একেবারেই এড়িয়ে চলে। তাই কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ আমারও ছিল। মেয়েদের কমন-রুমে গিয়ে ধরলাম ওকে। কিন্তু কল্যাণী সুস্মিতার কথার ধার-কাছ দিয়েও গেল না। বলল—তুমি শরদিন্দু মজুমদারকে চেন?

—না তো, কিন্তু কেন?

—অঞ্জলিকে চেনো তো?

—হ্যাঁ, সঞ্জীব এক সময়ে খুব যেত ওদের বাড়ি।

—যে করেই হোক শরদিন্দুবাবুকে ওকে বিয়ে করতে রাজী করাতে হবে।

—দেওয়ালে-দেওয়ালেও সেইরকমই একটা ইঙ্গিত দেখলাম বৈকি, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—বিয়ে করতেই হবে এবং অবিলম্বে। এর বেশী কিছু বলতে পারবো না বাপু।—কল্যাণী লাল হয়ে উঠলো এটুকু বলার লজ্জাতেই। আমারও আর বাকী ছিল না অবস্থাটা বুঝে নিতে। একটু ভেবে

তাই বললাম—এসব নোংরা ব্যাপারে আমি নেই। অন্য কাউকে বল।

—আমি কাকে বলবো? আর তুমি-না দশজনের ভাল করে বেড়াও। এইবেলা পালিয়ে গেলে চলবে কেন? শরদিন্দুকে বুঝিয়ে বলতে হবে, না বুঝলে সে যা করেছে তার দায়িত্ব নিতে তাকে বাধ্য করতে হবে। এর মধ্যে নোংরামির প্রশ্নই বা আসে কোত্থেকে? না, না তোমাকেই করতে হবে এ কাজ।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—কাল একবার দেখা করো আমার সাথে—বলে কল্যাণী চলে গেল। আমারও ক্লাস ছিল না। লাইব্রেরী থেকে বই পাল্টে বাড়ি চলে এলাম। সমীরকে বলে এলাম, সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা হলে যেন আমার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আর রাত্তিরে ওকেও আসতে বললাম।

সিঁড়ি-কোঠার ঘরটা ভেজান ছিল। ঠেলে ঢুকতেই উঠে বসল সুস্মিতা। আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল ও। বইটা হাতে করে পাশ কাটাতে চাইল এবারে। আমি দাঁড়ালাম পথ আগলে। এমনি হয়। মানুষের জীবনে যা ঘটে তার বেশীর ভাগ বোধহয় এমনি অপ্রত্যাশিত, অভাবিতই ঘটে। না হলে সুস্মিতার পথ আগলে দাঁড়াবো কেন সেদিন। ও তো যেতেই চেয়েছিল। কেন যেতে দিই নি! পথ আগলে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করছিলে এখানে?

—ঘরটা গুছিয়ে রাখছিলাম।—মুখ নিচু করেই উত্তর করল সুস্মিতা।

—ওটা তো সুজুর কাজ, তুমি কবে থেকে হাতে নিলে?

একটু চুপ করে ম্লান হাসিতে সুস্মিতা উত্তর করল—যেদিন থেকে প্রয়োজনের বইটা ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে হাতের কাছে পাও। যেদিন থেকে সিগারেটের জন্য তিনবার ভোলাদাকে বাজার পাঠাতে হয় না। যেদিন থেকে আলসেমির জন্য সারা রাত বাতি জ্বেলে

রাখতে হয় না, হাতের কাছে বেড্ সুইচের জোগান্ পাচ্ছ—সেইদিন থেকে।—আশ্চর্য আস্তে আস্তে বলে গেল সুস্মিতা তারপর বলল—পথ ছাড়ো।

ছাড়ি নি পথ। হাতের বইগুলিকে ছুঁড়ে ফেললাম অদূরের বিছানায়। তারপর সেই দুই হাতে ওর মুখটাকে তুলে ধরলাম। বাধা দেয় নি সুস্মিতা। অজস্র চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম। ঠোটে, চোখের পাতায়, সিঁথির কাছটায় কপালের ওপর। সুস্মিতা কিছুই বলে নি। শুধু অশ্রুর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন? তারপরে একসময়ে আমার হাত ছাড়িয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে। আর অবাক হয়ে আমি ভাবছিলাম—তবু কান্না কেন?

আরও একটু পরে মনে হলো, এ আমি কি করলাম? ভরদুপুরে এ কোন ভূত আমার মাথায় চেপেছিল—এ তো কোনদিনই চাই নি আমি।—এত বড় কমিটমেণ্ট!—এর বোঝা বইতে পারবো তো?

নিজের জীবনের যেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই, জটিলতার নেই অন্ত, আরও জটিলতায় জড়িয়ে পড়লাম কেন! আরও একজনকে বা কেন জড়িয়ে নিলাম?

সুস্মিতা যদি ভুল করেও থাকে, আমি কেন তার জোগান দিতে গেলাম। ভুল করেছি—হ্যাঁ, ভুলই, যে ভুলের রেমেডি আমার জানা নেই।

সঞ্জীব এলো চারটে নাগাদ। বললে, কি ব্যাপার রে?

ব্যাপার বললাম। কল্যাণী যা বলেছিলো সেইটেই ভেঙ্গে বললাম আর কি। শুনে গুম হয়ে বসে রইল। ভোলাদা চা খেতে ডাকল এই সময়। সঞ্জীব বলল, তুই যা—আমি এখন চা খাবো না।

খুব শক্ড্ হয়েছে সঞ্জীব। একেবারে 'থ' বনে গেছে। অগত্যা আমি বললাম, দু কাপ চা আমাদের ওপরেই পাঠিয়ে দে ভোলা দা।

চা আসার আগেই কিন্তু চলে গেল সঞ্জীব। বললে, কিছুই ভাল লাগছে না রে। বড্ড নার্ভাস ফিল করছি। চলেই যাই। আবার আসবোখন। উত্তরেরও অপেক্ষা না রেখেই চলে গেল।

যেতেই দিলাম। আমারও ভাল লাগছিল না। কে অঞ্জলি, কে শরদিন্দু—আর কে তার জের টানছে!

সঞ্জীব চলে গেল। আমিও আর নিচে নামলাম না। বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নিয়ে আসুক চাটা এখানেই। সুস্মিতা শুয়েছিল খানিকক্ষণ আগে আমার এ বিছানায়। ওর চুলে-মাখা দামী তেলের গন্ধটা তখনো জড়িয়ে ছিল আমার বালিশে। যতক্ষণ চা না এল বালিশে মুখ গুঁজে সেইটেই উপভোগ করতে লাগলাম। আশ্চর্য! তেলের গন্ধ আমি কোনদিন সইতে পারি না। কেমন যেন গা বমি-বমি করে। নিজেও তেল ব্যবহার করি না কোনদিন। অথচ আজ আমারই বালিশে জড়ানো অন্যের মাথার চুলের তেলের গন্ধে নাক ডুবিয়ে পড়ে রইলাম। আশ্চর্য বৈকি!

ভালবাসা কি মানুষের রুচি-বোধকেও পাল্টে দেয়? এমনি করেই! না এটা একটা রুচির বিকার।

—সঞ্জীবদা চলে গেল?—চা নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল ভোলাদা।

—হ্যাঁ চলেই তো গেল।

—তুমি নিচে যাবে নাকি?

—না। ভালো লাগছে না শরীরটা।

—কি হলো আবার?

—মাথাটা ধরেছে।

সত্যি তো। হঠাৎ খেয়াল হলো, মাথাটা ধরেছে তো টিপটিপ। ভোলাদাকে বললাম—আমায় একটা এ্যাস্পিরিন্ বা সারিডন আনিয়ে দিস তো।

সারিডন আসার আগেই অডিকোলনের শিশি হাতে এলো সুজাতা। পেছনে পেছনে সুস্মিতা আর সুনীতা।

—কোথায় ধরেছে মাথা? দেখি!

—সে কি! সবাই মিলে এখন সেবা শুশ্রূষা শুরু করে দেবে নাকি?

—না না একটু ম্যাসেজ করে দিক ভালো লাগবে দেখো। —আরো পেছনে যে মিসেস সেনও ছিলেন লক্ষ্য করি নি।

আমি উঠে বসে বললাম—অত সিরিয়াস কিছু নয়, কি কাণ্ড!

—আচ্ছা, আচ্ছা তোমায় উঠতে হবে না। আমিই যাচ্ছি নিচে, সুজু মেখে দিক অডিকোলনটা, আর, তোরাও বসে বসে একটু গল্প কর। ভালো লাগবে।—তিনি নেমে গেলেন। আমিও আবার শুয়ে পড়ে বললাম—তবে তাই হোক। এ ঘরটায় চেয়ার নেই, ছোট ছোট তিনটে মোড়া—তাতেই কাজ চালাই। দুটো মোড়া টেনে বসল সুস্মিতা আর সুনীতা। খাটেরই এক ধারে বসে সুজাতা ততক্ষণে সেবায় লাগোয়া।

গাল-গল্পে কাটলো খানিকক্ষণ। একসময়ে আমি ডেকে সুজুকে জিজ্ঞেস করলাম—সুজু বেড়াতে যাবে না আজ?

সুস্মিতাও বললে—হ্যাঁ, বেড়াতে যাবি তো তোরা যা, আমি তো থাকছিই।

চলে গেল ওরা। মোড়া ছেড়ে খাটের একপাশে বসে সুস্মিতা হাত রাখলো আমার কপালে। বললে—ভালো লাগছে একটু? —আর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল—একি তোমার তো জ্বর হয়েছে। দাঁড়াও থার্মোমিটারটা আনি।

ওর হাতটা ধরে ফেললাম—না যেতে হবে না। এক্ষুণি আবার উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠবে সবাই।

—টেম্পারেচার রয়েছে তো?

—আমি জানি। ও কিছু নয়, একটু স্ট্রেন পড়েছে তাই। সেরে যাবে। হৈ-হল্লা, ডাক্তার-কোবরেজ করো না এ জন্যে।

তখনো হাতটা ছাড়িয়ে নেয় নি সুস্মিতা, টেনে বসিয়ে দিলাম ওকে আবার।

—কি অদ্ভুত!—মন্তব্য করলে ও।

—তাইতো বলছি—ওর কথার জের টেনেই বললাম আমি, —সময় থাকতে কেটে পড়। জড়িয়ে পড়ো না, জড়িয়ে পড়ো না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, সেই আশ্চর্য আস্তে আস্তে সুস্মিতা বলল—আমি জানি। এটাই তোমার মনের কথা। তোমার সংশয় কাটে নি এখনো। কি জানি যদি কোনদিন না-ই কাটে, সেদিনের জন্যও জেনে রেখো আমার কোন অভিযোগ নেই।—আবার একটু থেমে বললে—আফটার অল হোয়াট রিমেন্স, এ স্ট্রং সেন্স অফ ইনসাল্ট। তারও স্বাদ তো পেয়েইছি।—যেন নিজের মনে মনেই বললে সুস্মিতা।

ওর এই মুড্‌টা বড় অস্বস্তিকর। আলোচনাটাও বড় বেশী সিরিয়াস হয়ে উঠলো হঠাৎ। ওর হাতটাকে নেড়ে দিয়ে ককিয়ে আব্দারের ভঙ্গিতে বললাম, একটু হাত বুলিয়ে দাও না মাথায়।

ম্লান হেসে সুস্মিতা আমার চুলে বিলি কাটতে লাগলো।

অনেক রাত্রিতে এলো সমীর। আমি জেগেই ছিলাম। একবার ডাকতেই সাড়া দিলাম—দরজা খোলাই আছে চলে আয়।

কল্যাণীর অর্থাৎ অঞ্জলির প্রব্লেমটা ওকে বললাম। ও বললে, —শরদিন্দু কোথায় থাকে?

—পুরান-পল্টনে, ঠিক কোন বাড়িটা জানি না।

—দেখি, আমি খোঁজ নেব একবার। মণির কোন খবর আছে?

—না। কুমিল্লা থেকে কালুদা এসেছিলেন বললেন—পরশু জিতেন দা আসবার কথা আছে। কালুদার কাছেই আমি খবর দিয়েছি যে তুই ইন্‌টার্নড, যেন সুযোগ পেলে তোর সাথে দেখা করেন। তারপর এই সেই রাজনীতির কথা উঠে পড়ল। অবশেষে আমি বললাম—যা-ই হোক, অঞ্জলির কথাটা একটু ভাবিস। আর চলে যা আজ, জ্বরটা বেড়েছে মনে হচ্ছে।

—বেশী জ্বর নাকি? কপালে হাত রাখলো ও।

—টেম্পারেচার নিই নি? মনে হচ্ছে এখন যেন বেড়েছে।

—কাল বেরোস না আর।

—না।

সমীর চলে গেল। ঘুম আসছিল না। টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল খেলাম। একটু জল হাতে নিয়ে মুখে-চোখে মাখলাম। আবার শুয়ে পড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কৈ ঘুম !···

সারা রাত জেগে থাকার ক্লান্তিতেই বোধহয় সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে চোখ মেলে চাইলাম। দেখি কপালে হাত রেখে সুস্মিতা দাঁড়িয়ে।

চোখ চাইতেই বললে—কেমন আছ ?

—কটা বেজেছে ?

—প্রায় সাতটা, কেমন লাগছে এখন ?

—বড় টায়ার্ড লাগছে যেন। রাতে ঘুম হয় নি ভাল।

—সারারাত বক্‌বক্ করলে আর ঘুমুবে কখন ? কি দরকার ছিল এই অসুখের মধ্যে ! চা খাবে ?

—আনো।

সুস্মিতা নিচে নেমে গেল। আর এত ভালো লাগছিল এই স্নেহের শাসন ! উঠে বসলাম। খাটের রেলিংয়ে ভর করে আধ-শোয়া হয়ে বসলাম। সুস্মিতা ফিরে এলো একটু বাদেই। হাতে এককাপ গরম চা, ধোঁয়া উঠছে তখনো। দেখেই খারাপ লাগাটা অর্ধেক কমে গেল।

—অমল আছিস ?—সঞ্জীবের গলা। বললাম—ভেতরে আয়। ঘরে ঢুকল সঞ্জীব। চুল উস্কোখুস্কো। সারারাত বোধহয় ঘুমোয় নি। ঢুকেই সুস্মিতাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সেটা মুহূর্তের ব্যাপার। পরক্ষণেই বলল—কিছু মনে করবেন না, পাঁচ মিনিটের জন্য একটু নিচে যান আপনি।

—সিয়োর।—বলে সুস্মিতা তক্ষুণি নেমে গেল।

—ঠিক করে ফেললাম—বললে সঞ্জীব।

—কি ?

—অঞ্জলিকে বিয়ে করবো আমি।

—কার সঙ্গে ঠিক করলি ?

অপ্রস্তুত সঞ্জীব বললে—মনে ভেবেছি আর কি! দরকার হলে ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি আমি।

—ছুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। উতলা হস্ নি, তাতে লাভ নেই। প্রব্লেমটা আরো জটিল। সমীরকে বলেছি ও শরদিন্দুর সঙ্গে দেখা করবে। দেখি আগে ও কি বলে। হয়ত অসম্ভব নয়, অঞ্জলিকে বাঁচাতে ওকে বিয়ে করতেই হবে কারুর, যদি শরদিন্দু রাজী না হয়। তবু একথা ভুললে তো চলবে না, অঞ্জলি আজ শরদিন্দুর ছেলের মা হতে যাচ্ছে। বিয়ে করাটা তো শুধু আজকের উত্তেজিত মুহূর্তের একটা ডিশিসন মাত্র নয়। তার পরিণতি সারা জীবন ধরে বর্তায়। অতএব তুইও আরো ভাব। তা ছাড়া সমাজ আছে। অঞ্জলির আত্মীয়-স্বজন আছে, মাসীমা মেশোমশাই আছেন। তাদের কথা ভাববি তো?—আমি ইচ্ছে করেই সঞ্জীবকে ডিসকারেজ করি। দেখা যাক্।

সঞ্জীব চুপ করে রইল। আমি হেসে বললাম—তাড়াহুড়ো করিস নে। এখন চা খা, মাথা ঠাণ্ডা কর।

সুস্মিতা চা আনতেই গিয়েছিল। আর এক কাপ চা নিয়ে এল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল—আসতে পারি? চা-টা রেখেই চলে যাবো।

—আসুন, আসুন—বললে সঞ্জীব।—আমাদের কথা আপাততঃ হয়ে গেছে।

সুস্মিতা ঢুকতেই বলল—ডোন্ট্ মাইণ্ড, একটা ব্যাপারে বড্ড ডিসটার্বড্ ছিলাম।

—নট এ্যাট অল্! কিন্তু ওকে বকাবেন না। ও খুব অসুস্থ। তায় কাল সারা রাত বক বক করেছে যেন কার সঙ্গে।

এইটে আশা করে নি সঞ্জীব। আমার সঙ্গে কথা বলবে কি বলবে না এইটে নিয়ে সুস্মিতার ইণ্টারফিয়ারেন্সে বিস্মিত হয়েছে ও। অবাক দৃষ্টিতে চাইল সুস্মিতার দিকে। পরে আমার দিকেও। আর তারপরই কিছুটা আঁচ করে নিয়ে, হেসে একটা মোড়া এগিয়ে দিল

—তবে আপনিই বসুন। বক্‌বক্‌ না করতে পারলে আবার চলে না কিনা আমার।

—তবে বসুন বক্‌বকানির লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।—হেসে নিচে নেমে গেল আবার।

একটু পরেই উঠে এল সুনীতা—ও, আপনি? গল্প করতে এসেছেন? এই এত সকাল বেলা? ভালো করে ঘুম থেকেই তো উঠি নি এখনো।

—গল্প করবো তো বলি নি, বক্‌বক্‌ করবো।

—দুটোতে তফাৎ কি?

—গল্প করার, যেমন ধরুন, বিশেষ সময় দরকার, বিশেষ লোক ছাড়াও গল্প করা চলে না। আর বক্‌বক্‌?—যে কারো সঙ্গে যে কোন সময়ে—ভালো করে ঘুম না ভেঙেও বক্‌বক্‌ করা যায়—আপনার সঙ্গেও।

—বাঃ সত্যি তো বেশ বক্‌বক্‌ করেন আপনি।

—তবে?—বাকীটুকু সঞ্জীব বুঝিয়ে দিল ভুরুর কোঁচকানিতে।

—হুঁ—দুষ্টু হাসিতে মোড়া টেনে বসল সুনীতা।

—এই ধরুন, কাল সন্ধ্যায় খেলাম একটা আস্‌মান্‌-ওস্‌মান্‌—একেবারে মনের মধ্যিখানটায়—

—আস্‌মান্‌-ওসমান্‌ কি?

—তাও জানেন না? তবে শুনুন। ছোটবেলায় ঘুড়ি ধরেছিলাম একটা। কাটা ঘুড়ি উড়ে এসে পড়ল একেবারে বাড়ির সামনে। ধরলাম। হোক্‌ না দু পয়সা দাম। তবু এই কাটা-ঘুড়ি ধরতে পারার একটা অনেক দামী আনন্দ ছিল। কিন্তু আনন্দটা বেশীক্ষণ টেঁকসই হল না। ইয়া গাঁট্টা চেহারার এক মুসলমান—খালি গা, পরনে লুঙ্গি, বুক ভর্তি কালো কালো লোম, তায় ঘাম ঝরছে। বললে—দাও ঘুড়ি।—বললাম,—কেন?—হেঁকে বললে,—দিমু এমুন্‌ আস্‌মান্‌-ওস্‌মান্‌—আর শেষ করলে না। ট্যারা চোখে চেয়ে রইল ঠায়। দুঃখের ছেলেবেলা। কিল চিনেছি চড় চিনেছি, ঘুষি খেয়ে

রক্ত গঙ্গা—সব জানি। কিন্তু আস্‌মান্‌-ওস্‌মান্‌? সে আবার কি জিনিষ? শেষ দেখবার উৎসাহ বাকী রইল না আর। দিয়ে দিলাম ঘুড়ি। ঘুড়ির স্মৃতিটা তুদিনেই ভুললাম, কিন্তু আস্‌মান্‌-ওস্‌মান্‌?—সেই থেকে ভীতি হয়ে চিরকাল গেঁথে রইল মনের সঙ্গে।

—কিন্তু আসলে ওটা—

সুনীতাকে শেষ করতে না দিয়েই সঞ্জীব বলে উঠল—ওটা চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না—ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এর স্বাদ নেই, এর গন্ধ নেই—তাইতো আরো ভীষণ। দেখছেন না কাল সারারাত ঘুমুই নি, সকাল বেলা পরামর্শ নিতে বন্ধুর বাড়ি ছুটে এসেছি। সব চুল খাড়া হয়ে গেছে। এরই নাম আস্‌মান্‌-ওস্‌মান। এমন কড়াপাকের ব্যাপার—এ আস্‌মান্‌-ওস্‌মান্‌ না হয়ে যায় না।

এই রকম চলছিল বক্‌বকানি। তারপর একসময়ে সঞ্জীব উঠলো। সুনীতাও চলে গেল নিচে। যাওয়ার আগে সঞ্জীব বলে গেল ওকে যেন ইন্‌ফরমড্‌ রাখি অঞ্জলি-ঘটিত কোন কিছুতে। সুনীতা জিজ্ঞেস করল শারীরিক কুশল। তুজনে ওরা এক সঙ্গেই নেমে গেল। সঞ্জীব বেরিয়েছিল অতি ভোরে।

—ব্রেক্‌ফাস্ট করে যান।

—না, আজ আর দেরী করবো না।

অভিযোগ করতেই এসেছিল কল্যাণী। আমার জ্বর হয়েছে দেখে ও আশ্বস্ত হলো।

বললে—ভেবেছিলাম ভয়ে পালিয়ে গেলে তুমি। তিনদিনের মধ্যে পাত্তা নেই আর, এদিকে অঞ্জলির অবস্থা সঙ্গীনতর। বাড়ির লোকের গঞ্জনা তিরস্কার, অপমানের ভয়, অনুশোচনার লজ্জা—বেচারী একেবারে মরমে মরে আছে। কি করি এখন বলো তো। আমি ছাড়া একটি বন্ধুও নেই আর ওর আজকে।

বললাম—এইটাই ভুল ভেবেছ। সঞ্জীব এসেছিল, বলে গেছে

দরকার হলে অঞ্জলিকে বিয়ে পর্যন্ত করতে রাজী আছে ও। সমীর শরদিন্দুর সঙ্গে আলাপ করেছে। প্রথমটায় আলাপ করতেই রাজী হয় নি শরদিন্দু, পরে যখন বুঝলো, তাতে সুবিধা হবে না। তখন ভেবে দেখার জন্য সাতদিন সময় চেয়েছে। এই একটু আগে সঞ্জীব এসেছিল, ওকে বললাম, অঞ্জলির সঙ্গে দেখা করে একটু সাহস দিতে ওকে। যেন না ভেঙ্গে পড়ে। আর কীই বা করতে পারি ? আমাদের পক্ষে তো আর ওর বাড়ি যাওয়া চলে না। বিশেষ করে এই সময়ে ওর আত্মীয়স্বজন তো আরও খাপ্পা হয়ে আছে বাইরের বন্ধুবান্ধবের ওপর। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয় এমন কেউ আমরা তো আর ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি না, করেই বা কি লাভ ?

কল্যাণী বললে—দেখো কি বলে শরদিন্দুবাবু। সঞ্জীববাবুর প্রস্তাবটাও ভেবে দেখো। হয়ত শেষ অবধি শরদিন্দুবাবু রাজী হবেন না। কারণ আমার ধারণা যারা রাজী হবার, তারা এ কাজ করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম জোর করে রাজী করিয়ে বিয়ে দেওয়ানোতে কোন লাভ নেই। আল্টিমেট্লি তার ফল ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং সঞ্জীববাবুর উদারতার ওপর ভরসা রাখাই ভালো। আমি উঠি। কি করো না-করো জানিও।

এদিকে দিন সাতেক হয়ে গেল। শরদিন্দু দিন সাতেকই সময় চেয়েছিল। সমীর বলল—এবারে যেতে হয় আর একবার। —গেলও। সঙ্গে নিয়ে গেল লাড়ুমামাকে। লাড়ুমামাই চরমে তুললেন ব্যাপারটাকে। লাড়ুমামা মদখোর—মাতাল। লাড়ুমামা রেস খেলুড়ে—জুয়াড়ী। লাড়ুমামার চাক্কু শিক্ষককেও রেহাই দেয় না—গুণ্ডা ছাড়া আর কি বলবো। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে লাড়ুমামা নিস্পৃহ। মেয়েঘটিত কোন কেলেঙ্কারীর সঙ্গে তাঁর নামে জড়তা নেই। এই একটা জায়গায় লাড়ু নিষ্কলঙ্ক।

ব্যাপারটা শুনে থেকেই রাগে গরগর করতে লাগলেন। বললেন, ছেড়ে দে আমার হাতে, দিতাছি ঠিক কইরা।

সমীর বলল —না, আমার সঙ্গে আসুন আপনি। আগে দেখি এমনি মেটে কি না।

মিটল না এমনি। শরদিন্দু বলল, ভাবলাম তো, কিন্তু আমার পক্ষে ওকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না।

—কেন ?—জিজ্ঞাসা করল সমীর।

—দেখুন, ওর চরিত্র সম্পর্কে আমার চেয়ে তো ভালো জানবার কথা নয় আপনাদের ? এমন মেয়েকে স্ত্রী করা যায় না ?

—ভুল সবাই করে। আপনিও করেছেন। আপনার দায়িত্বও অপরিহার্য। শরদিন্দুবাবু আপনি শিক্ষিত। এই নিয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। আমার প্রশ্ন, আপনার দায়িত্ব আপনি কি ভাবে পালবেন।

—আমি শুধু শিক্ষিত নই। উচ্চ শিক্ষিত, রুচিবান। আমার পক্ষে এ সব ব্যাপারে আলোচনাটাই অত্যন্ত কষ্টকর।

এবারে কঠিন হলো সমীর। মনে মনে বুঝে নিল সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। বলল, যে রুচির পরিচয় আপনি দিয়েছেন তারপর এসব কথা অচল। আমি শুধু জানতে চাই আপনার দায়িত্ববোধ এরপরে আপনাকে কি করতে বলে।

—আমি তো বললাম, এ নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে এ আমার জানা ছিল না। অদ্ভুত জায়গা এই ঢাকা।

—জানি না পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এসব ব্যাপার আপনার মত এত সহজে নিয়ে থাকে। তবে এটা সত্যি আমরা তা নিই না। আপনি বিলেত ঘুরেছেন, কলকাতা দিল্লী করেছেন, কিন্তু আপনি তো ঢাকারই ছেলে, এতো আপনার না জানবার কথা নয়। কটা ছেলে আপনার মত অমন মিশবার সুযোগ পেয়েছে মেয়েদের সঙ্গে ? বাইরের ছেলেদের সঙ্গে সহজে মেলে মেশে—এমন মেয়ের সংখ্যা হাতে গোনা। তবু যখন মেশে ছেলেদের তার মর্যাদা দেওয়া উচিত। আপনার কি বলবার থাকতে পারে ? আপনি কি সে সুযোগের অপব্যবহার করেন নি ?

—এমন কে কাস্টোডিয়ান্ আছে যার কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

—সবাইয়ের কাছে দিতে হবে। যারা এই অপব্যবহারকে অন্যায় মনে করে। আমিও তাদের একজন। আমিও কৈফিয়ৎ চাই।

শরদিন্দুর নির্লজ্জতায় সমীর রাগে ফেটে পড়ল এবার। এত চিৎকার করে কথাটা বলল যে পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো ছেলেমেয়েরা। সেই দিকে তাকিয়ে শরদিন্দু বলল, আপনি যে লোক জড়ো করে ফেললেন। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। এখন যান।

—উত্তেজনার কারণের কোন বাকী আছে নাকি ?

—কিন্তু এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। ভদ্রলোকের পাড়া।

—বারে ভদ্দরলোক।—লাড়ুমামা সেইথেকে রেগেই ছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিলেন শুধু। কোন কথা বলেন নি। আর পারলেন না। বললেন—বারে ভদ্দরলোক।

—আপনি কে ?—প্রশ্ন করলো শরদিন্দু।

—আমি লাড়ু গুণ্ডা।—সিগারেটে দীর্ঘ টান দিলেন লাড়ুমামা। যেন গুণ্ডাত্বটা ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন।

—মারবেন নাকি ?

—মাইরা তক্তা বানাইয়া দিমু। আরে মশয় আপনার মতলব-খান্ তো আগেই বুঝছি আমি। ভিতরে এমন সোন্দর বৈঠকখানা, আপনে যখন দরজা আগ্‌লাইয়া খাড়াইলেন তহনৈ আপনার মতলবখান্ বোঝন গ্যাছে। খাড়াইয়া খাড়াইয়া শুন্‌তা ছিলাম, দেখতা ছিলাম।

—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন।

—থোন্ ফালাইয়া ভদ্রতা। আবিয়াত মাইয়ার প্যাট্ বানাইয়া উনি ভদ্দরলোক সাজছ্যান্। মাইরা আউজগা তক্তা বানামু। দেখি কোন্ হালায় বাঁচায় ?

—মুখ সামলে কথা বলুন—

—আর কমু না—হঠাৎ এগিয়ে এসে শরদিন্দুর কলার ধরে এক টানে ওকে সরিয়ে নিয়ে এলেন একেবারে রাস্তায়, কশে চড় মারলেন গালে। গজরাতে লাগলেন, কথা কমু না আর অহনে কাম। লোক জড়ো হয়ে গেল। নিরুপায় শরদিন্দু সমীরের কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা করলো এবারে—সমীরবাবু, এসব কি ?

—কাস্টোডিয়ান্‌রা তো এসেছেন, কৈফিয়ৎ দিন।—জড়ো হওয়া লোকদের দেখিয়ে শ্লেষের সুরে বলল সমীর।

—কি হয়েছে, কি হয়েছে—সমবেত প্রশ্ন কৌতুহলী জনতার।

—আরে কন্ ক্যান্। আপনাগো পাড়ার এই ভদ্দরলোক এউক্কা আবিয়াত মাইয়ার সঙ্গে ম্যালা ম্যাশা করত। মাইয়াগার সন্তান হইব। আমরা ভদ্দরলোকেরে কইলাম, দোষ যখন করছ্যান্ ফল ভোগ কর্যান্। মাইয়াটিরে বিয়া কইরা ফালান্। অহনে এই হ্যাব চরিত্রের ভদ্দরলোক কইতাছ্যান, মাইয়ার চরিত্র খারাপ। আপনারাই কন্, ছাইরা দিমু, না দিমু আর এক-দুইখান্। লাড়ু মামা আবার চড় ওঠালেন।

দু-একজন ভদ্রলোক—পাড়ারই—এগিয়ে এলেন, বললেন, এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। ছেড়ে দিন, তারপর বসে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে ঠিক করুন, কি ভাবে কি করা যায়।

তাই ঠিক হলো। পরদিন বিকেলে পাড়ার দু-তিনজন ভদ্রলোকও থাকবেন, আর লাড়ুমামা, সমীরও আসবে। শরদিন্দুর বাড়িতেই ঠিক হলো আলোচনার জায়গা।

তার পরদিন গিয়েছিলও সমীর আর লাড়ুমামা, কিন্তু চাকর বলল, বিশেষ জরুরী কাজে সাহেব সকালের প্লেনে কলকাতা চলে গেছেন। কবে আসবেন ঠিক নেই।

পাড়ার সেই ভদ্রলোকেরাও এসেছিলেন। বললেন, আশ্চর্য তো! আমরা সত্যি বিশ্বাস করি নি ব্যাপারটা। ভেবেছিলাম কোথাও কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি আছেই। তাই না আসতে রাজী হলাম। কিন্তু ছোকরা যে পাকা বদমায়েস এ আগে বুঝি নি। তোমাদের আর

কি বলবো বাবা—ভাল করতেই চেয়েছিলে—পারলে কই? আর মেয়ের মা-বাপই বা কি রকম? যার-তার সঙ্গে অমন মিশতে দিতে হয় মেয়েকে?

ব্যর্থ আক্রোশে গজরাতে গজরাতে ফিরে এলেন লাড়ুমামা, পাশেপাশে নীরব চিন্তান্বিত সমীর—এবারে কি হবে? অঞ্জলি-সমস্যার সমাধান কি?

ক্রিং ক্রিং। মুখতুলে চাইল সমীর। বীরেনের সাইকেলের ঘন্টি। বললে, তোকেই খুঁজছিলাম। মাইনে বাকী কেন তোর এত? সময়ে বলবি তো! পার্সেন্টেজও নেই। তিনটায় আসবি কালীদার ওখানে, আমি থাকবো। চলি। কোথায় গিয়েছিলি তুই?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল বীরেন।

সঞ্জীব গিয়েছিল, কিন্তু দেখা করে নি অঞ্জলি। বলেছিল, ও কেন এসেছে আমি জানি মা। ওকে বলে দাও, আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। আমার দায় আমি নিজে নিতেই জানি।

সেই কথা জানাতে এসেই কেঁদে পড়লেন অঞ্জলির বিধবা মা।—আমার লেখাপড়া-জানা মেয়ে, একি করল সঞ্জীব? তোরা থাকতে এ কি হলো? শুনলাম বিলেত ফেরত, ব্যারিস্টার, খুব বিদ্বান, কিন্তু এ কোন কালসাপ ঘরে ঢুকিয়ে ছিলাম আমি। আমার মেয়ের সর্বনাশ করে গেল। অথচ দেখ, এ ব্যাপারে বাইরের কাউকে বলাও যায় না—না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে, আমি এখন করি কি?—অনেক কাঁদলেন।

অঞ্জলি হয়ত ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত একটা কিছু সুরাহা হয়েই যাবে। শরদিন্দু এমন করে ডোবাবে না ওকে। সঞ্জীবের কাতর অনুরোধ শুনলে না। অবশেষে সঞ্জীব উঠে গিয়ে ওর বদ্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, অঞ্জু আমার কথা শোন, দরজা খোল লক্ষ্মীটি।

কোন উত্তর নেই।

—আমি তোকে একবার দেখেই চলে যাবো। কিছু বলবো না আমার কোন আর্জি নেই। দরজা খোল।

অঞ্জলি নীরব।

—অঞ্জু কথা রাখ।

ফিরেই আসতে হলো। অঞ্জলি দরজা খোলে নি তবু। ছোট শহর কিছুই লুকানো থাকে না। যেমন থাকে নি অঞ্জলি-শরদিন্দুর প্রণয়-সংবাদ। একটা যোগচিহ্নের তুই পাশে দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপিত করেছিল নির্লজ্জ ইটের অক্ষরে।

কে জানে কে করেছিল ? কে জানে কি করে জেনেছিল তারা। তাই শরদিন্দু ভয়ে পালিয়েছে, একথা রটতেও দেরি হল না। আর অঞ্জলি যখন শুনল যে শরদিন্দু পালিয়েছে তখন, না তখনো ভেঙ্গে পড়ে নি অঞ্জলি।

নিজের দায় শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি নিজেই নিয়েছিল।

কল্যাণীর তুশ্চিন্তা, সঞ্জীবের উৎকণ্ঠা, লাড়ুমামার ব্যগ্রতা—সব একদিন অবসান হলো।

সবাইকে দায় মুক্ত করে বিদায় নিল অঞ্জলি। যে সমস্যার সৃষ্টি ও করেছিল, সমাধানও নিজেই করে গেল। নিজের দায় নিজেই নিতে পেরেছিল অঞ্জলি। আমরা বৃথাই ভেবে মরেছি। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তার সম্ভাব্য সন্তানকে নিয়ে সরে পড়ল অঞ্জলি, সরে পড়ল এ পৃথিবী থেকেই।

তবু যখন অঞ্জলির কথা মনে হয়েছে, আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, ভেবেছি আর ভেবেছি। যে মেয়ের কলমের ডগায় এতবড় বিদ্রোহের ইসারা, সমাজ-অব্যবস্থাকে এক কথায় এমন নস্যাৎ করে দেবার ইঙ্গিত জোগায় যে মেয়ে, সে মেয়েই আবার কেন আত্মহত্যা করে ?

কড়িকাঠের সঙ্গে শাড়ির আঁচলায় ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল অঞ্জলি। আর আত্মহত্যার স্বীকৃতিতে সহজ এক পংক্তি দোয়াত চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল টেবিলের ওপর ঃ

'মা হওয়ার অপরাধে আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলাম।'

অভিযোগ নয়, অনুযোগ নয়, সহজ স্বীকৃতির এক পংক্তি। আর এইটাই আরো বিশদে লিখে গিয়েছিল সঞ্জীবের কাছে। মরণের দিনই বোধ হয়। সে চিঠি সঞ্জীব পেয়েছিল ওর মৃত্যুর পরে। অঞ্জলি তাতে লিখেছিল, 'এমন এক জগতে যাচ্ছি, যেখানে তোদের এই এত নিন্দার লেশমাত্রও আর আমায় পৌঁছুবে না।' হয়ত সত্যি, মৃত্যুর ওপারের সেই জগত থেকে এপারের যত নিন্দাধ্বনি সব উপেক্ষা করা চলে। চলে বলেই কি অঞ্জলি জোড়া-মৃত্যুর গুরুভার নিয়ে সরে পড়লো ?

ডাক পিয়ন বাইরে থেকে ডাকলো, সঞ্জীবদা আছিস ?

—কে ?

—আমি হারুদা, তোর চিঠি আছে।

—চা খাচ্ছি হারুদা, ভেতরে এসে দিয়ে যা।

ছোট শহর সবাইকার সঙ্গে সবাইয়ের আলাপ পরিচয়। ডাকাডাকিতে অন্তরঙ্গতার ঘনিষ্ঠতার সুর। ডাকপিয়ন তাই দাদা হয়। পাড়ার মুদী দোকানদার হয় কাকা বা মামা।

—চা খাবি হারু দা ?

—না রে, অনেক চিঠি আছে আজ।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা রেখে চলে গেল হারু পিয়ন। চিঠিটা হাতে সঞ্জীব ভাবলো কার চিঠি ? বুঝে উঠতে পারলো না। অবশেষে খুলেই অবাক। অঞ্জলি ?

অঞ্জলি চিঠি লিখেছে ? কি লিখেছে অঞ্জলি ? রইল পড়ে চায়ের পেয়ালা। কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল পুঁথিপত্তর। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল সঞ্জীব। অঞ্জলি লিখেছে ঃ

সঞ্জীব, তুই যেদিন দেখা করতে এসেছিলি, আমি দেখা করি নি। আজ তোর কথা বড় বেশী মনে হচ্ছে। তাই এই চিঠি।

আমাকে তুই ভালবেসেছিলি, সমস্ত মন উজাড় করে দিতে

চেয়ে ছিলি একদিন। কিন্তু শুধু মন নিয়ে খুশী হতে পারি নি আমি। আজ মনে হচ্ছে—যদি পারতাম, তবে হয়ত এত তাড়াতাড়ি, এমন করে বিদায় নিতে হতো না পৃথিবী থেকে।

এ চিঠি যখন তোর হাতে পৌঁছুবে তার আগেই আমিও নিশ্চিত এমন এক জগতে পৌঁছে যাবো যেখান থেকে মানুষ আর ফেরে না—ফিরতে পারে না। এই এত নিন্দার লেশ পরিমাণও যেখানে আমার কানে আর পৌঁছুবে না।

তবু জানিস। নিন্দায় বিচলিত হয় নি আমি। সে তো আমার পাওনা রে। সেইজন্যই আত্মহত্যা করছি না। আমার কারণ অন্য। দেরিতে হলেও শরদিন্দুকে আমি চিনেছি। তোর মত বোকা নয় শরদিন্দু। শরদিন্দু তাই মন চায় নি আমার কাছে, আর যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে শরদিন্দু। আমিও যে দেবার জন্যই তৈরী হয়ে ছিলাম, এ শরদিন্দু বুঝেছিল। তাই তো পালিয়েছে শরদিন্দু। পালিয়েছে। পালাবেই তো। বাকী মূল্যে বিকিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। দেবার আগ্রহে খরিদ্দারকে যাচাই করি নি আর। তার ফল আমাকেই ভুগতে হবে তো।

শরদিন্দু পালিয়েছে আমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। আর এইজন্যই আমাকেও পালাতে হচ্ছে। নইলে শরদিন্দুর সন্তান আমাকে রেহাই দেবে না। সে তো শুধু শরদিন্দুরই নয়—সে যে আমারও সন্তান রে।

আজকের এই এতো নিন্দা যদি নিদারুণতর হয়ে আজকেই ক্ষান্ত হয় তবে কিছুই বলার থাকতো না। সে নিন্দার অনুযোগ আমি মাথা পেতে নিতাম।

কিন্তু যেদিন আমার ছেলেকে অবজ্ঞা উপেক্ষার নিন্দাবাদে অপরিচিত কতজনা বলবে—এ পরিচয় হীন, এ সেই শরদিন্দুর জারজ—সেদিন?

সেদিন মা হয়ে সন্তানের এত বড়ো অপমান কি করে সইব?

তাই আমার জন্য নয়। শরদিন্দুর জন্য নয়। আমার সন্তানের জন্যই তাকে নিয়ে সরে পড়েছি।

আমার একটা অনুরোধ, শরদিন্দুকে তোরা কিছু বলিস না। ওকে তোরা ক্ষমা করিস। আমি অভিশাপ দিয়েছি শরদিন্দুকে, ও যেন জীবনে আর কোনদিন পিতা হ্‌ওয়ার গৌরব অর্জন করতে না পারে।

আমি ওরই সন্তানের মা। এ অভিশাপ বৃথা হবে না।

তোদের কোন ক্ষতিই তো করে নি ও। তোরা ওকে ক্ষমা করিস। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই তোর জন্যে। তুই যেন জীবনে সুখী হতে পারিস। মরীচিকার পেছনে যেন আর ঘুরতে না হয় তোকে। আমার মত মন্দ মেয়ে নয়, এবার একটি ভাল মেয়ে দেখে শুনে ভালোবাসিস। আর এবার যেন ইঁদুরটাকে খুঁজে পাস্‌। ইতি—

অঞ্জলি।

জায়গায় জায়গায় অশ্রুর ফোঁটা। আর সেই সেই জায়গায় লেখাটা লেপ্টে গেছে।

সম্বিত হারিয়েছিল সঞ্জীব। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল চিঠিটা হাতে করে। মিনিট কয়েক। তারপরে ছুটে বেরিয়ে এল আমার বাড়ি।

—অমল, অমল—

—কে ?

—শীগ্‌গীর নেমে আয়। ওর ডাকের মধ্যে ব্যগ্রতাটা এতই স্পষ্ট যে দৌড়েই নেমে এলাম নিচে। কেঁদে ফেলল সঞ্জীব। এই দেখ, অঞ্জলি সুইসাইড্‌ করেছে। চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল ও।

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম চিঠিটা। তারপর ভোলাদাকে ডেকে বললাম, আমার জামাটা নিয়ে আয় তো ওপর থেকে। এক মিনিটের মধ্যে আসবি। এরই মধ্যে, চেঁচামেচি চীৎকারে মিসেস সেন, সুস্মিতা ওঁরাও বেরিয়ে এলেন।

স্নিগ্ধা এগিয়ে এসে আমায় বললে, কি হয়েছে ? কে সুইসাইড্ করেছে ?

কোন উত্তর করলাম না। কিই বা বলা যায়।

মিসেস সেন কিছু বললেন না। এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন। তারপরে বললেন, একটু দাঁড়াও তোমরা, আমিও আসছি।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম অঞ্জলিদের বাড়ি তখন নটা বেজে গেছে। বাঁধানো বারান্দায় সিমেন্টের ওপর বসেছিলেন অঞ্জলির মা। তখনো আঁচ করেন নি বিপদ। অঞ্জলির কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, দুবার তিনবার তো ডাকলাম। সাড়াও দিলে না, দরজাও খুললে না।—বলে দেখিয়ে দিলেন অঞ্জলির শোবার ঘরটা। তখনো বন্ধ। চুপ করে রইলাম। এবারে কি বলা যায়। এবারে এগিয়ে এলেন মিসেস সেন। অঞ্জলির মাকে বললেন, আসুন তো আপনি, একটু কথা রয়েছে আপনার সঙ্গে। আমি অমলের কাকীমা হই।—ডেকে ওকে নিয়ে গেলেন কোণের ঘরটায়, আমাদের বললেন, ব্রেক, ওপন্ দি ডোর।—ইসারায় অঞ্জলির ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

তারপর হৈ-চৈ, কান্নাকাটি, পাড়া-প্রতিবেশী, রাস্তার লোক, অবশেষে পুলিশ। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মিসেস সেন সব সামলালেন, এবং তিনি ছিলেন বলেই, নইলে পুলিশ অত সহজে ছাড়তো না। কেলেঙ্কারীর একশেষ হতো।

কিন্তু সব ছাপিয়ে দুটো ছবিই আমার মনে পড়ছিল। বারে বারে —ঘুরে ঘুরে। কড়িকাঠের কাঠামোর সঙ্গে একটা লম্বা লোহার রডে ঝুলছে একটা বন্ধ ফ্যান। আর তারই পাশে হৃদয় যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি মেয়ের মৃতদেহ। অঞ্জলি শাড়ির সঙ্গে নিজেকে ফাঁসিতে লটকেছিল।

আর টেবিলের ওপর রাখা দোয়াত চাপা অঞ্জলির এক লাইনের

'মা হওয়ার অপরাধে আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলাম।'

আর যখনি মনে হচ্ছিল পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করছিলাম চিঠিটা। প্রথমেই সবার অজ্ঞাতে চিঠিটা সরিয়ে ফেলেছিলাম আমি।

কেমন যেন মনে হয়েছিল এটা কারো হাতে, বিশেষ করে পুলিশের হাতে না-পড়াই ভালো।

অনেক বেলায় সেদিন ফিরে এলাম বাড়ি। থানার সেকেণ্ড অফিসার এক পাশে ডেকে বলেছিলেন, আপনি না বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ইনটার্নড্। এসব ঠিক হচ্ছে কি—এই যে এসেছেন এখানে পারমিশন না নিয়ে—

এ না হলে আর পুলিশ ? তবু আমায় স্নেহই করেন ভদ্রলোক। বহুবার আগেও দেখেছি। কিন্তু চলেই বা আসি কি করে ? বিশেষত মিসেস সেন রয়ে গেলেন যে। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বেলা দেড়টা।

মিসেস সেনই এলেন তখন, বললেন চলো এবারে যাওয়া যাক। চলে এলাম। সঞ্জীবকে দেখলাম না কাছেপিঠে কোথাও। বাড়ি ফিরে এলাম। এসেই ওপরে চলে গেলাম। কারো সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়।

সুস্মিতা, সুনীতা, বিশেষ করে সুজাতা যদি জিজ্ঞেস করে কি হয়েছিল, কে অঞ্জলি, সঞ্জীববাবু কাঁদছিলেন কেন ? কিন্তু কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ওপরে উঠেই দেখি সুস্মিতা। শুয়েশুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

কিন্তু আরও দেখেছি, ওদের এই সংযম। দেখেছি, ভেবেছি, মনে হয়েছে কৃত্রিম। এ সংযমটাই কৃত্রিমতা। আর তক্ষুণি এও মনে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই, জীবনে কৃত্রিমতারও প্রয়োজন আছে তো তবে।

সুস্মিতা উঠে বললে, বড্ড টায়ার্ড লাগছে, না ? ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। দাঁড়াও। খাবার জোগাড় দেখি আমি। তুমি ততক্ষণে স্নানটান সারো। এই তো খেয়ে এলাম আমরা।—নিচে চলে গেল সুস্মিতা। একেবারেই ও আলাপের কাছে ঘেঁষল না—নারী-সুলভ অনুসন্ধিৎসায়ও নয়। এমনি বার কয়েকই দেখেছি। যখনি বিন্দুমাত্র

ও আঁচ করেছে যে কোন আলাপে আমি অনিচ্ছুক, সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কথা পেড়েছে।

আরও একবার। অনেক রাতে এলেন জিতেনদা। পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী গেটে তালা লাগানোর পর আবার আমি খুলে রেখেছিলাম ওটা। তিনি গেট পেরিয়ে আসলেন সোজা আমার সিঁড়ি-কোঠায়। তেমনি বলা ছিল ওকে। কিন্তু বলি নি বাড়িতে আর কাউকে। অনেকক্ষণ কথা হলো—জরুরী এবং গোপনীয় কথা। যাবার সময় আমিও নিচে নেমে এলাম আবার গেটে তালা দিয়ে রাখলাম।

জিতেনদা বললেন, অবিলম্বে এ্যাবসকণ্ড্ করতে হবে। আন্দোলন আসন্ন। এই বেলা সরে পড়তে হবে, ধরা পড়ার আগেই। ধর-পাকড় শুরু হলো বলে।

সেই আন্দোলনের ভবিষ্যৎই সকালে বসে বসে ভাবছিলাম। সুস্মিতা এসে জিজ্ঞেস করলো, কে এসেছিলেন কাল ?

—কি করে জানলে ?

—জানি আমি, বলো না কে ?

বললাম, কবে আসছেন তোমার বাবা।

—কাল—মুখটা কালো হয়ে গেল সুস্মিতার। যেই মুহূর্তে বুঝল আমি আলাপ করতে চাই না এ সম্বন্ধে সেই মুহূর্তেই চেপে গেল সুস্মিতাও। অন্য কথা পাড়ল।

অবান্তর দুচার কথা—এ, ও, তা বলে চলে গেল। যাবার আগে অবশেষে বলল, কাল যিনি এসেছিলেন, গেটে তালা দিয়ে তুমি চলে আসার পরে আবার ফিরে এসেছিলেন তিনি। ডাকছিলেন তোমাকে। আমি শুনতে পেয়ে জানলাটা খুলতে প্রথমে বুঝতে পারেন নি, বললেন, তালা দিয়ে দিলি নাকি ? একটু কথা বাকি রইল যে।

আমি বলেছিলাম, খুলে দেবো তালা ? আমার গলার স্বরে চকিত হয়ে চাইলেন একবার জানলাটার দিকে, তারপর হন্‌হনিয়ে চলে গেলেন, একবারও পিছনে না তাকিয়ে। তোমারই বাড়ির লোক,

তার কাছেও এত লুকোচুরি? একটু আশ্চর্য নয়? তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তবে বুঝেছি তুমি কিছু বলতে চাও না—বলেই আর দেরি করল না সুস্মিতা। একেবারে হনহনিয়ে নেমে গেলো নিচে।

আমি আর কথাটা তুলি নি, আমি তুলি নি বলেই সুস্মিতাও আর কোনদিন এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করে নি।

কদিন থেকেই সঞ্জীবের কথা ভাবছিলাম। সেই থেকে ও আর আসে নি। সকড্। সকড্ তো বটেই, তবু এলে, গল্প আলাপ আড্ডার মধ্যে অনেকটা ভুলতে পারবে। আর সেইটাই দরকারও। কিন্তু মিসেস সেন অঞ্জলির চিঠিটা দেখেছেন। কি ভাবছেন ওর সম্পর্কে সেটা অস্পষ্ট যে। তাই ওকে ডাকতে কেমন কিন্তু কিন্তু ছিল মনে মনে। মিসেস সেনই বললেন একদিন, তোমার বন্ধুর কি হলো? ওকে আসতে বলো। আলাপে গল্পে মনের ভারটা কেটে যাবে আস্তে আস্তে।

মিসেস সেন সম্বন্ধে ধারণাটা ক্রমশ পাল্টাচ্ছিল আমার। সে দিন অঞ্জলিদের বাড়ি সেই পুলিশ অফিসারটিকে ডেকে নিজের পরিচয় দিয়ে, প্রয়োজন হলে এস. পি. বা ডি. এম.-কে ফোন করে দেবার প্রতিশ্রুতিতে সমস্ত ঝক্কিটাই যেমন নিজের কাঁধে তুলে নিলেন স্বেচ্ছায়, এমন কে করে? তবু মনে হয়েছিল, সঞ্জীবের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করেন হয়তো। কিন্তু আজকের কথায় আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। বললেন, আলাপে গল্পে মনের ভারটা কেটে যাবে আস্তে আস্তে। বিকেলের দিকে আসতে বলো চায়ে—সেই থেকে তো আর খোঁজও নাও নি বোধহয়। সত্যি খোঁজ নিই নি।

কিন্তু আরও আশ্চর্য হলাম সুস্মিতা ও সুনীতা এমনকি সুজাতাও যখন এ প্রসঙ্গে আজও কোন কথা তুলল না, তখন। ওরা এটা বুঝেছিল, কি আমি, কি মিসেস সেন এই ব্যাপারে ওদের কারো সঙ্গেই আলোচনা করতে তেমন উৎসুক নই। তাই আজও যখন আলোচনা উঠল তবু চুপ করে থাকল ওরা। যতটুকু জানল তাই যেন যথেষ্ট অথবা তাও ভাবে নি হয়ত। কোন একটা ঘটনা ঘটেছে

—সিরিয়স নিশ্চয়।—আত্মহত্যা করেছে অঞ্জলি। আর তাইতে সঞ্জীবের মন ভার-ভার। কোন কোন বিকেলে হয়ত চায়ের টেবিলে এ বাড়ির অতিথি হবে সে। একটু বা গল্প, একটু বা আলাপের দাওয়াই তার দরকার—মন ভার-ভারটা কাটানোর জন্য। কিন্তু এই কি সব? জানতে ইচ্ছে হয় না কে অঞ্জলি? কি সম্পর্ক সঞ্জীবের সঙ্গে? কেন আত্মহত্যা? কিন্তু ওরা জানতে চায় নি।

এই সংযমের কথা আমি যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে, বড় কৃত্রিম। আর সঙ্গে সঙ্গেই একথাও মনে হয়েছে তবে তো কৃত্রিমতারও প্রয়োজন জীবনে।

মিছামিছি হয়ত বিব্রত, অপ্রস্তুত হতাম আমি। তার হাত থেকে এ কৃত্রিমতাই না রক্ষা করেছে আমায়।

আমার কোথায় দ্বিধা ছিল, আমি সুস্মিতাকে আপনার করে নিতে পারি নি। আমার সমস্ত কাজে-অকাজে ওকে সমানভাবে ডাকতে পারি কই?

কিন্তু পারি না কেন? দুটো কারণ আমার মনে হয়েছে। এক —আই. সি. এস. পিতা মিঃ সেন সম্পর্কে একটা অকারণ ভীতি ছিল আমার। অকারণ বলছি এই জন্যে যে ওঁর সম্পর্কে নির্ভয় হবার ভরসা সুস্মিতা আমায় দিয়েছিল।—তুমি তো জানো না বাপীকে, একেবারে জলের মত মানুষ। রসিকতা পেলে আর কিছু চান না। জনার্দনের সঙ্গে অবধি যা তা ঠাট্টা করে বসবেন। আসুন তিনি, দেখবে।—কিন্তু তবু মনে মনে ভীতিটা ছিলই।

আরো একটা কারণ ছিল। এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বচ্ছন্দতায় আর উচ্চশিক্ষার কৌলিন্যে একটা কেতাদুরস্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। স্বাতন্ত্র্যটাই যার প্রধান লক্ষণ। সুস্মিতা মুখ্যত এই সমাজের। আর আমি ওখানে প্রায় অচল।

কোন কিছু ভালো লাগা, এক কথা। আর তার জন্য নিজের পরিবেশ, এনভাইরনমেন্টকে অস্বীকার করা, এনভাইরনমেন্ট ত্যাগ করা, অন্য জিনিষ। যেমন আজ যদি এমন হয় যে সবকিছু ছেড়ে,

যে আবহাওয়ায়, যে পরিবেশে আমার মন এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে, জীবন যুদ্ধের যে রীতি যে নীতিতে মন বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে—এক কথায় যাকে বলা চলে, আমার ওয়েজ অফ লাইফ তা ছেড়ে বা আমূল পাল্টে সুস্মিতাকে পেতে হবে। না হলে তাকে পাওয়া যাবে না। তবে যেমন আমি রাজী নই, তেমনি কথা সুস্মিতারও থাকতে পারে। আর আমি যখন রাজী নই তখন ও রাজী হোক এটাই বা দাবী করি কি করে। জীবনে কম্‌প্রমাইজ দরকার—এ্যডজাস্টমেণ্টের প্রয়োজন আছে সত্যি—এ আমি মানি। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব যে নয়, তাও জানি। জানি বলেই না দ্বিধা। আমরা দুজন যে আসলে দুই সমাজের, দুই আলাদা এনভাইরনমেণ্টের জীব।

যেদিন মিঃ সেনের আসবার কথা। বেশ একটা ভয় ভয় ভাব নিয়েই সেদিন সকাল হলো। তাড়াহুড়ো করে চা খেয়ে ওঁরা সবাই চলে গেলেন এয়ার-পোর্টে। আর আমি আশ্রয় নিলাম আমার সিঁড়ি-ঘরে। শুয়ে শুয়ে মনেমনেই ডিফেন্স নিচ্ছিলাম মিঃ সেনের সম্ভাব্য অভিযোগের। অভিযোগটা যেন অবশ্যম্ভাবী। যতই ওর আসার সময় কাছে আসতে থাকলো ততই এটা আমার মনে বদ্ধমূল হলো। তারপর কলরবে সুজাতা, সুনীতা যখন বাড়ি প্রায় মাথায় করে তুলেছে, বুঝলাম ওঁরা ফিরেছেন এয়ার পোর্ট থেকে। আর তক্ষুণি কেমন মনে হলো, সওয়াল জবাব সব বৃথা। এক্ষুণি যেন রায় হয়ে যাবে, মিঃ সেন যেন বলছেন—তুমি তো বাপু নির্দোষ নও। আমার মেয়ে সম্পর্কে অন্যায় মনোভাব পোষণ কর।

নিচে নেমে গেলাম না আমি। যদিও মনে হচ্ছিল এইটে অশোভন। আমার দোষ প্রমাণ করতে এইটেই হয়ত আরও সাহায্য করবে। তবু—ভাবলাম, মনের যখন এ অবস্থা এক্ষুণি নিচে না নামাই তো ভালো। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে চটির শব্দ ফট্‌ফটিয়ে উঠে এলো সুস্মিতা।

—তুমি কি-ই ? বাপীর সঙ্গে দেখা করলে না, কি ভাবছেন ?

ওর স্বরে অভিযোগ আর অভিমানের মেশামেশি। সত্যি কথাই বললাম—আমার ভয় করছে সুস্মিতা।

—ছেলেমানুষী করো না, যাও তাড়াতাড়ি, কার্টসি বলেও তো একটা কথা আছে।

—কিন্তু—

—লক্ষ্মীটি যাও, একটু দেখা করে এসো আগে।—আমার মাথায় ওর চিরুনি চালিয়ে সুস্মিতা আব্দার করল। নেমে এলাম।

ড্রইং-রুমে ওঁরা সব পাঁচমেশালি গল্পের আসরে মেতেছেন। এতদিনের অদেখার পরে দুদিককার সংবাদের হৈহৈ আদান-প্রদান চলছে। সুজাতাই লীডার মনে হলো। মিসেস সেন বললেন, এই অমল।

—আই সি।—একটুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, বাট ইউ লুক ভেরী ইনোসেন্ট !

প্রায় ঘেমে উঠলাম। তার মানে কি ? তবে যে আমি ইনোসেন্ট নই ধরা পড়ে গেলাম নাকি ? কিসে ধরা পড়লাম ? না কি সুস্মিতা তার আদরের বাপীর কাছে সমস্তই নিবেদন করে বসে আছে। সেরেছে আর কি ? একটা ম্লান হাসির রেখা অবশ্যি ফুটিয়ে রাখতেই চেষ্টা করছি তখনো। আমার ভাবটা প্রায় মরিয়া—কেন মশাই আপনার মেয়ের দোষ নেই ? আর সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটাও ভাঙলো। মিঃ সেনই ভাঙ্গিয়ে দিলেন। বললেন, ইয়োর এস. পি. মেট মি এ্যাট দি এয়ার পোর্ট এ্যাণ্ড—সেতো বলে তুমি সাংঘাতিক লোক।—বলেই হেসে উঠলেন হোঃ হোঃ করে। আবার বললেন, আই হার্ড ফ্রম্ হিম দ্যাট্ ইউ আর এ টেররিস্ট—ইজ ইট ? এ যে দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, আই মিন ঘোগের ঘরে বাঘের বাসা—এ্যাঃ। আবার সেই ছাদ ফাটানো হাসি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম মনে মনে। আর নীরব হাসিতে ওর রসিকতা গ্রহণ করলাম। প্রায় সহজ হয়ে উঠলাম এক মুহূর্তে। এও ভাবলাম ঘোগও যে তোমা হেন বাঘের ঘরে বাসা পেতেছে এ তো

আর জানো না সাহেব। বললাম অবশ্যি মনেমনেই। মুখে কিছুই বলি নি। শুধুই ব্যাপকতর হাসি। তিনি বললেন, আবার নিজে থেকেই, এনি হাউ উই টট ইট আউট সাম টাইম লেইটার। নাউ—কি রকম আছেন তোমার বাবা? খবর কি ঢাকার? কি রকম লাগছে আমার এই মিষ্টি মিষ্টি তুষ্টু টাকে?

সুজাতাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে আদর করছিলেন তিনি। ওর গাল টিপে ওকে লক্ষ্য করেই শেষ প্রশ্নটা কিন্তু পরক্ষণেই যেন ভুলটা শুধরে নিয়ে বলে উঠলেন, না কি সুস্মিতাটাকেই পছন্দ তোমার? আবার সেই হাসি—হোঃ হোঃ হোঃ—

আমার মুখে তখনো কথা জোগায় নি। যদিও বা বলবো বলে মনে মনে তৈরি হয়ে ছিলাম—আর না—।

সাংঘাতিক লোক আমি?—

মিসেস সেন আস্তে যেন আমার কান বাঁচিয়ে বললেন, আমি অবশ্যি শুনতে পেলাম।—কেন ওর পেছনে লাগলে, বেচারা ভাল-মানুষ, লজ্জা পাবে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে মিঃ সেন বললেন—আরো, বসো তুমি। একটু চা-া-া চলবে? ওহোঃ, এটা তো তোমারই বাড়ি—কি কাণ্ড! তুমি কিরকম জেণ্টেল ম্যান হে, আমায় চা অফার করো। আবার সেই হাসি।

অদ্ভুত লোক। সুস্মিতা ঠিকই বলেছে, এঁকে ভয়ের কিছু নেই। নিঃসন্দেহে আশ্বস্ত হলাম।

লাড়ুমামা অভিযোগ করলেন।

—এইটা তোমাগো কেমুনতর বন্ধুত্ব। পোলাটার খবর পর্যন্ত লও না। দিন নাই, রাইত নাই, সঞ্জীবটা আনালে বানালে ঘুইরা ব্যাড়ায়। কই যায় কই থাকে, সময় মত নায় না, খায় না, খোঁজও লও না একটা?

এই তো কাইল রাত কইরা গ্যালাম্ অর বাড়িতে, কয় বাড়িতে না। কয় কি হালায় ? রাইত বাজে এ্যগারটা অহন্ তরি বাইরে করে কি ? খুঁজতে বাইর হইলাম্। ঘুরতে ঘুরতে পাইলাম শ্যাষ পর্যন্ত। সেই নারিন্দার মোড়ে। দেহি একটুকরা ত্যানা লইয়া রাস্তার হ্যাওয়াল মুছতাছে। ঐ যে অঞ্জলির নাম জড়াইয়া তোমাগো ব্যারিস্টর সাহেবেরে কারা জানি হ্যায়ালে গাঁইথা রাখছিল, রাইত এ্যগারটায় তিনি হেই কলঙ্ক ঘুঁচাইত্যাছ্যান্। জল-ত্যানা দিয়া সেই ইটের ল্যাখা উঠাইতাছে রাস্তার দ্যায়ালে দ্যায়ালে। ভাইব্যা হ্যাখ অবস্থা কি ! আমি কাইল বাড়িতে পেঁীছাইয়া দিছি। কিন্তু তোমরা একটু লক্ষ্য কইর। পোলাটা তো পাগল হইয়া যাইব।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কি উত্তর দেব ? আমি ইনটার্নড্। সমীর নানা কাজে এত ব্যস্ত যে ওর পক্ষে সঞ্জীবকে এ্যাটেণ্ড করা সম্ভব নয়। আমি তো বাড়ি থেকেই বেরুতে পারি না। এই তো সেদিন থানায় হাজিরা দিতে গেলাম। ও. সি. ডেকে বলল, দেখুন অমলবাবু, আপনি ইনটার্নমেণ্ট অর্ডার ভায়োলেট করে সেদিন টিকাটুলি গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। খবর পেয়ে এত বিচলিত হয়েছিলাম যে এদিকে খেয়ালই ছিল না। আমি দুঃখিত।

—ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। আই সে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল্স্ !

—ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে, আমি তো বলছি আমার ওটা মনেই ছিল না একটা সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে। আর তা ছাড়া বিশ্বাস করুন যে কারণে আমায় ইনটার্নড্ করেছেন তার সঙ্গে এর কোন সংস্পর্শ নেই।

—মে বি, এ্যাণ্ড মে নট বি, ডাজন্ট ম্যাটার, মনে রাখবেন এ্যান, অর্ডার ইজ অর্ডার। ভবিষ্যতে এই রকম ভুল হলে, ইউ ওন্ট বি স্পেয়ার্ড। যান।

আসবার সময় সেকেণ্ড অফিসার মাথা নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইলেন। যার অর্থ মোটামুটি মনে হল, কেমন, বলি নি আমি ?

এ অবস্থায় আমিই বা সঞ্জীবকে কি করে আগলাই। চিত্ত, অশোক ওদের বলতে হবে। তাই ঠিক করলাম। লাড়ুমামাকে বললাম, চিত্ত আর অশোককে একটু খবর দিতে যেন আমার সঙ্গে আজই দেখা করে।

—আমি পারুম না। মাসের প্রথম—আমার অনেক কাম্। আর অরা কেউ আহে না 'চায়ের আসরে'। আমার হইছে নানান্ জ্বালা—কয়টা নতুন কলেজেপড়া ছ্যম্‌ড়া আড্ডা মারে চায়ের আসরে। তোমরা কেও নাই, তাগো যত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবো আমায়। আমি হালায় মদ্‌খোর, জুয়ারী,—আমি নি ঐ সব পারি? রেভল্যুশন্ কারে কয়? থার্ড ইন্‌টারন্যাশন্যাল্ কি? কম্যুনিষ্ট, আর-এস-পিতে তফাৎ কেন? হ্যান ত্যান—সাড়ে ছত্তিরিশ্ প্রশ্ন। যেইটা পারি, কই। না জান্‌লে কই অহনে ব্যস্ত আছি, পরে হইব নে। আহি তোমার কাছে, যাই সমীরের কাছে। উত্তর কি হইবে জাইনা আবার তাগোরে গিয়া হেইয়া কই। তাও কি হালার মনে থাকে? মইধ্যে মইধ্যে অর্ধেক্ কইয়া ভুইলা যাই। ছ্যাম্‌ড়ারা হাসাহাসি করে।

একটু থেমে আবার নিজের মনেই বললেন, অরা বোধহয় বোঝে যে আমি কিছু জানি না। কাররে জিগাইয়া আসি। বোঝছ্ই যদি তবে জিগাস ক্যান্? দিমু একদিন ধইরা—আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বোধহয় লজ্জা পেলেন।

—আইচ্ছা, কও তো ঝাম্যালা না? আইচ্ছা, চিত্ত আর অশোকরে খবর দিমুনে আমি আউজ্‌গাই।

লজ্জাই পেয়েছিলেন লাড়ুমামা। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

চলে গেলেন লাড়ুমামা। আর আমি ভাবতে লাগলাম সঞ্জীবের কথাই।

অঞ্জলি লিখেছিল, এমন এক জগতে যাচ্ছি যেখানে তোদের এই এত নিন্দার লেশমাত্র আর সেখানে পৌঁছুবে না।

কি জানি হয়ত সত্যি, অঞ্জলির সেই স্বর্গে মর্ত্যের নিন্দা-ধ্বনির প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সেখান থেকে অঞ্জলির দৃষ্টি কি এই মর্ত্যে এসে

পৌঁছোয় ? নির্জন নিশীথে জনবিরল নারিন্দার দেওয়ালে দেওয়ালে ওর কলঙ্কের ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হোক এই সংকল্পে যে প্রেমিক আজও ভিজে নেকড়ার প্রলেপ বুলোয় তার তবে সান্ত্বনা কোথায় ?

ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং। বীরু কাকা সাইকেলটাকে বারান্দার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। ঢুকল ঝড়ের মত।

সঞ্জীবের বাড়ি গিয়েছিলাম। পেলাম না ওকে। আজ নিয়ে তিনদিন, বলিস প্রোভোস্টের সঙ্গে শীগ্গীর দেখা করতে। পার্সেণ্টেজ নেই। বলে কয়ে বন্দোবস্ত করেছি—প্রোভেস্টের সঙ্গে যেন নিশ্চয়ই দেখা করে। আমার সময় নেই। আমি চলি।

—শোন, বীরেন।

বীরেন ততক্ষণে সাইকেলে সওয়ার হয়েছে। একটা পা মাটিতে রেখে একদিকে হেলে সাইকেল সমেত দাঁড়াল বীরেন।

—চিত্ত, অশোক, কি মঞ্জু—যাকেই পাশ য়ুনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস। আমি একটু দরকারেই আসতে বলেছি বলবি। কেমন ?

—আচ্ছা।

বীরেন চলে যাওয়ার পরেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো সঞ্জীব। কেমন আছিস ? প্রশ্ন করলো ও।

—আমি ভালোই আছি। তোর কি খবর ?

—কেন, ভালোই তো।

—অনেক রাত করে নাকি বাড়ি ফিরিস ?

—কে বললে ?

—লাড়ুমামা।

আমি যে সবই জানি। এ আর বলার দরকার নেই। লাড়ুমামার কাছে জেনেছি যে তুমি অনেক রাতে ফের, তার মানেই সব জানার বিজ্ঞাপন।

সঞ্জীব খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লজ্জিত হাসিতে বললে —লাড়ুমামাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

—লাড়ুমামাও যে সে কথাই বলেন তোর সম্পর্কে।

—বাদ্ দে ওসব। অন্য কথা বল।

—আসিস না কেন?

—আসবো এখন থেকে।—বলেই টেবিল থেকে একটা সাপ্তাহিক টেনে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল সঞ্জীব। অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময়ে আমি জানালাম যে বীরেন এসেছিল। প্রোভোস্টের সঙ্গে দেখা করতে বলে গেছে ওকে। আর তক্ষুণি লক্ষ্য করলাম সঞ্জীব পত্রিকাটা পড়ছে না। যদিও কাগজটার একটা পাতা খুলে সেইদিকেই চেয়ে আছে ও, তবু ওর মন সেখানে নেই। ডাকলাম—সঞ্জীব—

উত্তর নেই।

উঠে যেয়ে ওর কপালে হাতটা বুলিয়ে আবার ডাকলাম, কি ভাবছিস সঞ্জীব?

—কই? না তো। উঠে বসল ও। বলল, যাই, বাড়ি যাই এবারে।

—ব্যস্ত কি? যাবিই তো।

—অঞ্জলির সেই চিঠিটা কই—দে তো।

—দেবো। একটা কথার জবাব দে আগে। সারাদিন কি করিস, কোথায় থাকিস, কি ভাবিস?

—কি আর ভাবি।—ও আবার শুয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—অঞ্জলি, অঞ্জলি, অঞ্জলি। সারাদিন এই ভাবি। আমি চাই না। আমি ভাবতে চাই না। আমি ওকে ভুলতে চাই, আমি ওকে একেবারে ভুলে যেতে চাই—পারি না। মরে ভূত হয়ে আমার কাঁধে চেপে বসে আছে।

—ভুলে যা বললেই তো আর ভোলা যায় না সঞ্জীব। তবু বলি, এই ভালো হয়েছে, নিন্দার হাত থেকে ওকে তুই বাঁচাতে পারতি না, আমি না, সমীর না, লাড়ুমামা না, কল্যাণী না—যারা ওর শুভানুধ্যায়ী তারা কেউ না। এক পারতো শরদিন্দু। সে পালালো। নিন্দার হাত থেকে, লজ্জার হাত থেকে, আর ওকেও, যে বাঁচাতে

পারতো সে শরদিন্দুই শুধু। তাই মিছামিছি নিজের ওপর দায়িত্ব আরোপ করছিস কেন? কেন কষ্ট পাচ্ছিস অযথা। শুধু অঞ্জলি মৃত্যুর আগে তোকে একটা চিঠি লিখেছে বলে? মন সবারই খারাপ হয়েছে। তোর তো হবেই। তাই বলে অত আপসেট হবি কেন?

চোখের জলে ভূতটা আস্তে আস্তে নামতে লাগলো। হ্যাঁ, দুঃখের ভূত এমনি করেই অশ্রুর বন্যায়, কথার ফুলঝুরিতে হাসিঠাট্টা গল্পের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যায়। সঞ্জীবকেও তাই বললাম। আসবি, গল্প করবি, আর কিছু ভালো না লাগে অঞ্জলির কথাই বলবি। আর কাউকে ভালো না লাগে আমার কাছেই আসবি। তবু একা একা মনেচেপে ঘুরে বেড়াস নি। সময় একদিন সব ভুলিয়ে দেবে। সেই অবধি ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। পাগলামি করলে তো চলবে না।

—উঠতে ইচ্ছে করছে না। যাবো না আর এখন। আমার খাবার কথা বলে দে। আর বলে দে সবাইয়ের খাওয়া হয়ে গেলে যেন পরে ডাকে আমাদের।—তারপর একটু থেমে আবার বলল—মিসেস সেন কেমন আছেন? বড় ভালো লোক। অজানা অচেনা তবু কত করলেন সেদিন। না হলে পুলিশ হাঙ্গামা করতই।

—তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, বলছিলেন, আসতে বোলো। এসে গল্প-সল্প করতে বলবে, নয়তো মনটা খারাপ থাকবেই।

—বললাম তো, আসবো এবার থেকে।

ভোলাদাকে ডেকে ওর খাবার কথা বলে দিলাম। প্রায় সহজ হয়ে এসেছে সঞ্জীব। আর সেই মুহূর্তে নিচে থেকে পিয়ন হাঁকল, চিঠি—সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জীবের মুখটা আবার কালো হয়ে উঠল। বললে, অঞ্জলির চিঠিটা কই দে তো, একবার পড়ি।

চিঠিটা ওপরে দিয়ে গেল ভোলাদা—আমারই চিঠি, লিখেছে মণি। ওর হাতের লেখাটা এতই চেনা যে না খুলেও বোঝা যায়। খুললাম চিঠিটা। মণি লিখেছে ঃ

অমল,

অভিধানে মন বলিয়া একটি শব্দ আছে। এবং পরম কারুণিক ভগবান এই মন জনপ্রতি একটি একটি বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমার তাতে আপত্তি নাই। ঈশ্বরের পৃথিবীতে একা দুইটি মনের অধিকারী হওয়া যখন সম্ভব নয়, সে আপত্তিতে লাভ কি? আমার আপত্তি অন্যত্র। এই মন, সময়ে ভাল থাকে সময়ে মন্দ। আর, একটা যুৎসই অসময়ে যদি একবার 'মন্দ' হইয়া বসিতে পারে—তবে মন্দে মন্দে অনেকদিন কাটিয়া যায় কারণে, অকারণেও। এই যে অকারণ-মন-খারাপ, আমার আপত্তি এইখানে। আমি বলি হে দুষ্ট ভগবান, যদি মন দিলেই তবে সদাসর্বদা মন ভাল রাখিবার কায়দাটা শিখাইয়া দিলে না কেন? কদিন থেকে মনটা খারাপ অকারণেই, কারণ নেই বলছি এ কারণে, যে আমার কাছে এইটে কোন কারণ নয়—তবে মন খারাপ কেন? তাই তোকে এই পত্রাঘাত। তুই মনস্তাত্ত্বিক। মন খারাপের কারণ নির্ণয় তোর কাছে হয়ত সহজ হইলেও হইতে পারে।

কদিন আগে কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' আমার হস্তগত হইল। উঁহু, ইহা কোন সংবাদ নয় যে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকানে নামমাত্র মূল্যে নিবেদিত হয়। চেষ্টা করিলে গোটা রবীন্দ্রনাথকেই ওখান হইতে উদ্ধার করা চলে, তবু ইহা সংবাদ হইয়াছে, অন্য কারণে।

বইটার প্রথম পাতা খুলিয়াই চমকাইয়া গিয়াছিলাম। যে পাতায় পুরাতন মালিকের নাম লেখা আছে।

কল্যাণী পাল, ৫।১ প্যারী সুর লেন, টিকাটুলি, ঢাকা।

'নৈবেদ্য' কিনিয়াছি। 'নৈবেদ্য'-এর সমস্ত কবিতা আমার মুখস্থ। আশ্চর্য—তবু কেন কিনিলাম! যতই ভাবিয়াছি মন ততই খারাপতর হইয়াছে। তোর মনস্তত্ত্বের মেটিরিয়া মেডিকায় যদি

এবম্বিধ মন-খারাপের দাওয়াই থাকিয়া থাকে, তবে ঝটিতি প্রেসক্রিপসন্ ভেজিয়া দিবি। অন্যথায় 'মন-মন্দ' ব্যারামে তোর বন্ধু মর মর। আর কি ? সঞ্জীবকে দিন দশেক আগে এক পত্র দিয়াছিলাম। আজো উত্তর পাই নাই। যদি তোর হাতে থাকে, আমাকে কিছু টাকা পাঠাইবি। বড় টানাটানিতে আছি। ভালবাসার স্থায়ীত্বের কোন গ্যারান্টি নাই। টাকা না পাঠাইলে বেশীদিন নাও থাকিতে পারে। এবারকার মত ভালবাসা জানালাম।

—মণি

—কার চিঠি ?

—মণির। চিঠিটা এগিয়ে দিলাম সঞ্জীবকে।

মণির নিশ্চয় টাকার খুব দরকার। নইলে, ওকে তো জানি, লিখতই না। টাকা পয়সা সব থাকে ভোলাদার কাছে। নিচে গিয়ে ভোলাদাকে ডাকলাম। এইটে একটা কম্প্রমাইজ। এই নিচে যাওয়াটা। গলা ছেড়ে সিঁড়ি-কোঠা থেকে হাঁক দিলে আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যেখানেই থাক ভোলা শুনতে পেতোই।

কিন্তু 'সেন-গোষ্ঠির' সান্নিধ্যে আমার এই চেঁচামেচির বদভ্যাস প্রায় অন্তর্হিত। এখন নিচে গিয়ে আস্তে ডাকি, ভোলাদা শোন তো। —ওকে জিজ্ঞেস করলাম, টাকা পয়সা আছে কিছু ?

—অনেক। আমাকে তো প্রায় খরচ করতেই হচ্ছে না আজকাল। আমি খরচ করতে গেলেই মেম সাহেব হাঁ হাঁ করে ওঠেন। অনেক টাকা জমে আছে। কত চাই ?

এনভাইরনমেন্ট সবাইকে ইনফ্লুয়েন্স করে। ভোলাদাকেও করেছে। কতবার দেখেছি—মা, বাবা যখন এসেছেন ঢাকায়, মাকে ভোলাদা কর্তা-মা বলে ডাকে। আর আজ ? যদিও জনার্দনের মত সিলেব্‌লে সিলেব্‌লে গমক দিয়ে এখনো 'মেমসাব' বলতে পারে না তবু বলে মেম সাহেব। মেম সাহেব মানে মিসেস সেন।

সবাই পাল্টায়। মিসেস সেনও তো সেদিন অঞ্জলির মাকে

বলেছিলেন, 'আমি অমলের কাকীমা হই।' আমি মিসেস সেন —একথা তো বলেন নি। এই বদলানোটা মানুষ-মনের সহজাত প্রবৃত্তি। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

তত্ত্ব ছেড়ে কাজের কথায় এলাম। ভোলাদাকে বললাম, একশোটা টাকা আমায় দেতো, আর একটা মণি-অর্ডার ফরম নিয়ে আয় পোস্ট অফিস থেকে।

অঞ্জলি সুইসাইড করার পর থেকে কল্যাণীও আর আসে নি। একবার খোঁজ নিতে হবে। মণির চিঠিটা ওকে দেখাবো কি? উচিত হবে তো? অনুচিত কিসে?

উচিত হোক আর অনুচিত হোক সেকথা অবান্তর। কল্যাণীর খবর নিয়ে জানলাম, ও কলকাতায় চলে গেছে—কোন একটা ইস্কুলে মাস্টারি নিয়ে।

সমীরকে পাঠিয়েছিলাম। সমীরই খবর দিল, আর বলল, কল্যাণীর বাবা বলেছেন, সম্ভব হলে যেন আমি একবার দেখা করি তাঁর সঙ্গে। একপত্রে তক্ষুণি লিখলাম :

মাননীয়েষু,

আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। যাওয়ার উপায় থাকলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম। কিন্তু কিছুদিন থেকে আমি বাড়িতে ইনটার্নড্। অতএব আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। যদি তেমন প্রয়োজন মনে করেন, এবং একটু সময় করে আপনি আসতে পারেন তবে ভাল হয়। আমি সব সময়েই বাড়িতেই থাকি। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে।

—অমল

সেইদিনই এলেন তিনি। বিকেলের দিকে কোর্ট ফেরত। কল্যাণীর বাবা উকিল।

—তোমার কথা ওর মুখে অনেক শুনেছি, তাই তোমার কাছেই এলাম বাবা। মেয়েকে নিয়ে তো মুস্কিলেই পড়লাম আমি। ঐ একটি

মাত্র মেয়ে আমার। রোজগারও আমার মন্দ নয়। ওর মাস্টারি করবার দরকার কি?

যা বলে গেলেন এরপর, তাইতে বুঝলাম বিরোধটা বেধেছিল বিয়ে নিয়ে।

কল্যাণীর বিয়ে ঠিক—পাত্রও। এবং পিতার মতে সুপাত্র। কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয় কল্যাণী।

মা বুঝিয়েছেন, কল্যাণী রাজী নয়। বাবা বলেছেন, কবে মরে যাবো একদিন, বুড়ো তো হয়েছি, তাই তোর একটা হিল্লে না করে নিশ্চিন্ত হই কিভাবে?

কল্যাণী তবু রাজী হয় নি।

অঞ্জলির আত্মহত্যার পরে কথাটা আবার পেড়েছেন বাবা। কল্যাণী বলে, বিয়ে করবো না।

তবে অঞ্জলির মত 'ইয়ে' করে বেড়াও, বলেন বাপ। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে ওসব চলবে না। না। না।

বৃদ্ধ চটেছিলেন, স্বীকার করলেন কটুকথাই বলেছেন সেদিন। তাই বলে বাড়ি ছেড়ে—শুধু বাড়ি ছেড়ে নয়, একেবারে দেশ ছেড়ে সুদূর কলকাতায় মাস্টারি নিয়ে নিবি? বাপ-মা কি এমন কথা বলে না মেয়েকে? মেয়েরই কল্যাণ কামনায়—তবে? কলকাতা গিয়ে অবধি ঠিকানাটা পর্যন্ত জানায় নি। শুধু লিখেছে মাস্টারি করছে। ভালই আছে। চিন্তার কারণ নেই। স্কুলের নামটা পর্যন্ত জানায় নি। দুদিন পরে এম. এ. পরীক্ষা। করবিই যদি তো এম. এ.-টা ভালো করে পাশ করে কোন কলেজে প্রফেসারী কর—সেটা কত রেস্পেক্টেবল্। বল, তুমিই বল?—আমায় জিজ্ঞেস করলেন অবশেষে।

কিন্তু যেজন্য এসেছিলেন আমি ওকে সাহায্য করতে পারলাম না। কল্যাণীর ঠিকানা আমিও জানতাম না। সে কথাই বললাম। —আমাকে চিঠিপত্র কিছুই দেয় নি। সমীরের কাছেই শুনলাম প্রথম যে ও কলকাতায়। সেদিন সমীরকে পাঠিয়ে ছিলাম আপনার বাড়ি ওর খবর জানতেই। কোন খবর পেলেই আপনাকে জানাবো।

বৃদ্ধ চলে গেলেন। কল্যাণীর খবর জানতে এসেছিলেন, হতাশ হলেন। শুধুই কি কল্যাণীর খবর? কল্যাণীর বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, এই যে কল্যাণী বিয়েতে রাজী হচ্ছে না এর কারণটা আমি। ওঁর কথাবার্তায় এইটা আমার কাছে প্রকট হয়েছে। সেই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহের নিরসন হয়েছে তো ওঁর?

মণির চিঠিটা কল্যাণীকে দেখানো হলো না, দেখালাম স্মিতাকে। মণির চিঠিরই উত্তর লিখছিলাম তখন, যখন স্মিতা এলো। বললে,—কি লিখছো?—দাঁড়াল আমার গা ঘেঁসে।

লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। উত্তর না দিয়ে চিঠিটাই এগিয়ে দিলাম ওকে।

মণি,

কলকাতার পুরনো বইয়ের স্টলে নামমাত্র মূল্যে কল্যাণীর পুরনো বইও বিক্রয় হয় এটা সত্যি গ্রাহ্য-সংবাদ। কল্যাণীর জন্য ঢাকা ছেড়ে ছিলি, এবারে কল্যাণীর বই না তোকে কলকাতা ছাড়া করে। এমনি হয়। এ রোগ মনের ক্যান্সার। যতই এড়িয়ে চলো, শেষ পর্যন্ত এর হাতে নিস্তার নেই। আপাতত মন খারাপ দিয়ে শুরু হয়েছে—দেখা যাক। যদি কোনদিন কারণটা ধরা পড়ে, মনস্তত্ত্বের এ্যালোপ্যাথি মতে সেটাই একমাত্র রেমেডি।

চিঠি লেখার একটা মেজাজ দরকার। আজ সেইটের বড় অভাব, পরে পাতা পাতা সবিস্তার পত্র পাবি। আজ সংক্ষেপে সংবাদ এই:

(১) আজকের ডাকে একশ টাকা পাঠালাম।

(২) অঞ্জলি আত্মহত্যা করেছে—করতেই হয়েছে, কারণ শরদিন্দু। সঞ্জীব খুব আপসেট হয়েছে।

(৩) কল্যাণী কিছু দিন হলো কলকাতায় মাস্টারি করে, কারণ বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় পারিবারিক বিরোধ। বিয়ে করতে কেন রাজী হয় নি, জানি না। ভালবাসা জানিস।

—অমল

চিঠিটা শেষ করে সুস্মিতা বলল, ঠিক বুঝলাম না। আর ওকে বোঝাবার জন্যই মণির চিঠিটাও দেখালাম।

চিঠিটা শেষ করে টেবিলে নামিয়ে রাখল সুস্মিতা। আর আঙুলের চিরুনিতে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, মেজাজ ভালো নয় কেন?

—কে বললে?

—এই যে লিখেছো।—মণিকে লেখা আমার চিঠিটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ও।

একটু থেমে ভেবে নিলাম, তারপর বললাম, একটা গল্প শুনবে?

—হুঁ।

—ছেলেবেলায় রাজ-কন্যার গল্প শুনেছি। রূপসীর-রূপসী, সোনার কাঁকই-গোঁজা মেঘ-মেঘ চুল। স্বপ্নের পালঙ্কে ঘুমোনো রাজকন্যা, শিয়রে সোনার কাঠি আর পায়েতে রূপোর। তাকে জাগাতে হবে। রাক্ষসেরা দূরে গেছে এমন দিন বেছে নিয়ে পায়ের তলাকার রূপোর কাঠি শিয়রে রেখে, শিয়রের সোনার কাঠি রাখবো পায়ের কাছে, বলবো, রাজকন্যা, জাগো। রাজকন্যা তবে না জাগবে? তারপর রাক্ষসেরা আসবার আগেই কি করে কেটে পড়তে হবে, সেই মহৎ সঙ্কল্পের কষ্ট-কল্পনায় কত না বিনিদ্র রাত ভোর হয়ে গেছে —কিন্তু সে ছেলেবেলার কথা।

তারও পরে আরো বড় হয়েছি। এই বুড়ি গঙ্গা, ঐ শীতলক্ষ্যায় কত জল বয়ে গেল, কত জোয়ার, কত না ভাঁটা। দেখেছি। দেখতে দেখতে বড় হচ্ছি—বয়স বাড়ছে।

এমন সময় একদিন করোনেশন পার্কের একটা মিটিংয়ে দেখলাম জিতেনদাকে। তখন ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ি। জিতেনদা, ঐ যিনি সেদিন রাতে পালিয়ে গেলেন, তোমার কণ্ঠস্বরে। এমনি অপরিচিত কণ্ঠস্বরে যাকে পালাতে হয়, সমস্ত দিন একটা খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে, সারারাত ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয়। যার কাজের সঙ্গে আমিও জড়িয়ে গেছি আজ। এই জিতেনদাকে সেই প্রথম দেখি।

দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজের বিজ্ঞাপন—ছেয়ে গিয়েছিল সারা শহর।

করোনেশন পার্কে বিরাট জনসভা। বক্তা—জিতেন কুশারী।

গেলাম। সভা তখন শুরু হয়েছে। কেঁপে কেঁপে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে একটা উদাত্ত আহ্বান।

হাজারো হাজারো লাখো লাখো মানুষ দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না। হাজারো হাজারো লাখো লাখো মানুষের পরনের বস্ত্র জোটে না। কোটি কোটি আত্মা অশিক্ষায় কুশিক্ষায় ভূত হয়ে গেছে। সেইটাই জানতে হবে। সেইটাই বোঝাতে হবে। এদেশের গ্রামে গ্রামে, কৃষকের কুটিরে কুটিরে, মজুরের ধাওড়ায় ধাওড়ায়, সহরে বন্দরে এই সত্য পৌঁছে দিতে হবে। বলতে হবে—আধপেটা ভাত আর আধপেটা কলের জলে ভরপেট খাওয়ার চেয়েও সুখ আছে, বিনিদ্র শীতের রাত্রি ছেঁড়া কাঁথায় চেপে রাখার চেয়েও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন আছে, আর সেই সুখে সেই স্বাচ্ছন্দ্যে তোমাদের আছে ন্যায্যদাবী। সেই দাবীকে যে রাজশক্তি স্বীকার করে না, তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ। ব্যাটন নিয়ে, লাঠি নিয়ে, বেয়নেট বসান রাইফেল নিয়ে। এ মিটিং বে-আইনী, এ জনতা বে-আইনী।

তারপর চলল তাণ্ডব। তিল ধারণের জায়গা ছিল না করোনেশন পার্কে। লোকে লোকে লোকারণ্য। চারদিক ঘিরেছিল সশস্ত্র পুলিশ। এগিয়ে এল এবারে। মার—মার, কি বেদম্ মার!

গুলি, ব্যাটন্, বেয়নেট, হৈচৈ চীৎকার। আর্তনাদ, কার আগে কে পালাবে জনতার মধ্যে একটা ছুটোপুটি—আর লাল তাজা তাজা রক্ত, তাল তাল রক্ত পার্কের সবুজ দূর্বাকে লজ্জা পাইয়ে দিল।

রাজত্ব করবার লোভের ছবিটা একটা ধিক্কার-ধ্বনিতে মনের মধ্যে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেল সেদিন।

রাজকন্যা নয়, রাজ্য চাই। অটুট সঙ্কল্পে মনস্থির করলাম। মীরজাফরের বেইমানিতে বেহাত-হওয়া রাজ্য—বিনামূল্যে বিকিয়ে

যাওয়া সোনার দেশ, ফিরিয়ে আনতে হবে—ছিনিয়ে আনতে হবে। এ ধর্ম-যুদ্ধ। ধর্ম-যুদ্ধের সৈনিক হলাম। আর এই কালে এলো আমার রাজকন্যা।

বললে, তুমি তো কই এলে না—আমিই এলাম তবে। ফিরিয়ে দিতে পারি নি তাকে—ফিরিয়ে কি দেওয়া যায়?

সুস্মিতা দাঁড়িয়ে ছিল আমার বাঁ পাশে, গা ঘেঁসে। বাঁ হাতে জড়িয়ে আরো কাছে টানলাম ওকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও। মাথার চুলের মধ্যে হাতটাও থমকে থেমে আছে।

—আমায় কিছু বলবে?—অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল সুস্মিতা।

—বলবো। যাওয়ার আগে বলেই যাবো তোমায়।

—কোথায় যাবে?

—সম্ভব হলে তাও বলবো।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আস্তে আস্তে সুস্মিতা বলল, যে সংশয়ের কাঁটা তোমার মনে বিঁধে আছে সে যেন একদিন দূর হয়। জোর করব না, আর জোর করার অধিকারই বা পেলাম কই?

—অধিকার-বোধটা এমনি আসে না, এ অর্জন করতে হয়।

—কি জানি, কি দিয়ে, কতটুকু দিয়ে এ অর্জন সম্ভব!

উত্তর কে দেবে? নীরবে সময় বয়ে যেতে লাগল। তারপর একসময়ে আমার হাত ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেল সুস্মিতা।

মনে মনেই বললাম, আমার সংশয় তো তোমাকে নয়। আমার সংশয় যে আমাকেই। অনিশ্চয় ভবিষ্যৎ আমার—তোমাকেও এই সঙ্গে বেঁধে ফেলব কি না—বাঁধা উচিত হবে কি না, এ কর্তব্য-বোধের দ্বিধা। নিজের মনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব জয় করে তবেই না অধিকার অর্জন করতে হয়। আমি আজও পারি নি, তুমিই বা পারলে কই?

মনি, সঞ্জীব, অশোক আর চিত্ত। চারজন একই সঙ্গে এক ক্লাসেই সেণ্ট গ্রেগরীজ স্কুলে পড়তো। সে আমলে অশোক সম্পর্কে চিত্তর একটা ভীতি ছিল—কারণটা খুবই ওরিজিনাল। চিত্ত বলতো, —ও ব্বাবা, যা ফর্সা, দেখলেই মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে। ঝিমঝিমনি কমতে কমতে ফার্স্ট-ইয়ার নাগাদ লাগল। অর্থাৎ সেই সময়ে চিত্ত আর অশোকে গলাগলি ভাব। এত ভাব যে অশোক আই. এস্-সি.তে ভর্তি হলো বলেই চিত্তকেও সায়েন্স্ নিতে হলো। একই কম্বিনেশনে। সেই থেকে জোড়েই থাকে ওরা। প্রাক্‌টিক্যাল্ ক্লাসের পার্টনার, ভিক্টোরিয়া ক্লাবের ওপেনিং জুটি, আর আমাদের চায়ের আসরের জোড়া-জমিদার। ওরা দুজনেই জমিদারের ছেলে।

সন্ধ্যের পরে ক্লাব ফেরতা এলো চিত্ত আর অশোক।

—এ তো খবরের ছড়াছড়ি। বাড়িতে লাড়ুমামা, য়ুনিভার্সিটিতে সমীর। ক্লাবে দাম-মশাই। তুই নাকি খবর দিয়েছিস, কি ব্যাপার?

—আর খবর দিয়েই বা লাভ কি? খবর না দিলে যারা বেমালুম ভুলে থাকবে, তাদের খবর পাঠানোটাই তো ঝকমারী বিশেষ। এই এতদিনের মধ্যে একবার খোঁজও নিলি না আমার?

চিত্ত বলল, আগে দু কাপ চা বলো, তারপর গালিগুপ্তা যো কুছ, কোই আপত্তি নেহি, লেকিন পইলা চা—

—আসিস নি কেন এ্যাদ্দিন?

—ভয়ে।

—তার মানে?

—ভাই সত্য কথাই। শুনলাম তোমার বাড়ি কারা সব এসেছেন, কাঁধ পরিমাণ চুল, ঠোঁটে-নখে রঙ—শুনেই ব্যাস।

—ভয়টা কিসের?

—ভ-য়? আর কিছু না, যদি আওয়াজ দিয়ে ফেলি? সেই 'তাফালের' কথা তো জান না ভাই, সেবার বড় তাফালেই

পড়েছিলাম। মামাতো বোনের বিয়েতে গিয়েছিলাম কলকাতা। বাবা-মার রিপ্রেসেণ্টেটিভ হয়ে। বাবা-মার দেওয়া একছড়া হার আমাকেই প্রেজেণ্ট করতে হলো। আর যাই কোথা। আমি ততক্ষণে দি প্রিন্স অফ গালিমপুর বনে গেছি।

পরোক্ষে বোধহয় ছিলেন মা-বাবারা। কিন্তু এমন জানলে তাঁদের সঙ্গে তবু ফাইট দিতে রাজী ছিলাম। দু-এক রাউণ্ড টেঁকাও যেতো। প্রত্যক্ষে আমাকে যারা ঘিরে ধরলেন—যেদিকে চাই, হয় কাঁধ পরিমাণ চুল নয়তো রাঙানো ঠোঁট। আর সে কি প্রশ্ন সব, গালিমপুরে আপনার কয়টা হাতি আছে? হার প্রেজেণ্ট করলে যে হাতি পুষতেই হয় এ তো আর জানা ছিল না। ঘেমে উঠলাম। পকেট থেকে রুমাল তুলতে যাবো, বলে—কি হলো, কি হলো? একজন বলে, ও হে পাখাটা ঘুরিয়ে দাও, মিঃ রায়ের গরম লাগছে আর একজন তো হাতের বিলিতি মাসিক দিয়েই হাওয়া করতে শুরু করল। কি তাফাল্, কি তাফাল্। তারপর একটি ট্যাপাটোপা গোলগাল মত বেঁটে মেয়ে, সে বলে বসল—মিঃ রায়, একটু পৌঁছে দিয়ে আসুন না আমায়।—বলেই আর অপেক্ষা নয়, হাত ধরে টানাটানি।

অনেক সয়ে ছিলাম, আর পারলাম না। বলেই ফেললাম।—বারে লাট্টু।—ব্যাস তাফাল্। এই বুঝতে যতটুক দেরি।

কেঁদেকেটে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অবশেষে তিনি মূর্ছা গেলেন। নারীহত্যার দায়ে পড়ি আর কি!

তবে ভাই মাথাটা চিরকালই পরিষ্কার।

ডাক্তার, ডাক্তার করে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই নারী-ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলাম কোন রকমে।

সেই যে বেরুলাম, আর মামা-বাড়ি মুখো হই নি। শালা ডাক্তারের নিকুচি করেছে। সোজা শেয়ালদা স্টেশন। ভাই, আমি ভয় পাই সেই থেকে।

আমরা হাসতে লাগলাম। চিত্ত কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিল না।

—আজ যে বড় এলি ?—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—তুই বন্ধুলোক, ভাবলাম এতো করে যখন খবর দিয়েছিস, তখন ভয়ের কিছু নেই।

—তবে সেই থেকে তোর ধারণা, ববছাঁট্ লিপস্টিক মাখা মেয়ে হলেই তোকে তাড়া করবে।

—আমি একা কেন ? অল্ প্রিন্সেস অফ গালিমপুর্স্ যারা হাতি পোষে।

—প্লিজ এক্সপ্লেইন 'হাতি পোষে'।—এতক্ষণে কথা বলল অশোক। ওর কম বলাই অভ্যাস।

—অর্থাৎ আগে থেকেই পোষা অভ্যাস থাকা চাই আর কি !

আর ঠিক এই সময়ে একটা ট্রেতে তিন কাপ চা সাজিয়ে যে ঘরে ঢুকল তার চুলে ববছাঁট, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে লাল পালিস।

সুনীতা বলল—দেখ, কুণোদা, তোমার জ্বালায় আমি গেলাম। ঘনঘন ফরমায়েস করবে না অত। ভোলা, জনার্দন সব বাইরে। আমি অত পারবো না কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গিয়ে চিত্তকে বলে বসল, আপনি তো বড় অসভ্য !

চোখের ইসারায় অশোককে কি একটা বলতে চাইছিল চিত্ত। সেটা সুনীতার চোখেও ধরা পড়েছে।

সুনীতা এইরকম চটাং চটাং বলেই। কিন্তু ছেলেমানুষীটা ওর চলনে বলনে এতই প্রকট যে কথার রাফনেসটা মনে দাগ কাটে না। আমি আর অশোক হেসে ফেললাম। চিত্ত বলল, হ দিদি, আমি একটু অভদ্রই। মফস্বলের লোক, এটিকেট ঠিক জানি না।

—দিদি ! আমি আপনার দিদি হতে গেলাম কেন ? অদ্ভুত লোক তো !

তারপর ক্রিকেট ব্যাটটার দিকে নজর পড়তেই বলল, আপনি বুঝি ক্রিকেট খেলেন ?

অশোককেই করেছিল প্রশ্নটা। অশোক বলল, আমি খেলি,

চিত্তও খেলে।—যেন ক্ষমা করার মত একটা কারণ পাওয়া গেল এতক্ষণে।

—আপনিও খেলেন?

—একটু একটু।

—বেশী ভালো আর খেলবেন কোত্থেকে? যা আলু-ভাতে আলু-ভাতে চেহারা—হুঁ।

অশোককে জিজ্ঞেস করল, খেলে এলেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কাদের কাদের খেলা ছিল?

—ভিক্টোরিয়া, ওয়ারী।

—আপনি কাদের?

—আমরা দুজনেই ভিক্টোরিয়াতে খেলি।

—কারা জিতলো?

—আমরাই জিতেছি চার উইকেটে।

—গুড্।—প্যাট্রনাইজিং ভঙ্গিতে বলল সুনীতা। আবার প্রশ্ন, —কত করেছেন আপনি?

—আমি সতের করে আউট হয়ে গিয়েছিলাম। ও খুব ভাল খেলেছে আজ। চুয়াল্লিশ করে নট-আউট ছিল। চারটে উইকেট নিয়েছে পনের রানে।

—সত্যি? আবার কবে খেলা, আমায় দেখাতে নিয়ে যাবেন?

অমলের সঙ্গে যাবেন। অমলও খেলে তো।—এ্যাদ্দিন পুলিশ-পারমিশন ছিল না তাই। ক্লাব থেকে পারমিশন নিয়েছে। এবার থেকে যেদিন যেদিন ক্লাবের খেলা থাকবে সেই সেই দিনে খেলবার জন্য মাঠে যাবার পারমিশন দিয়েছে পুলিশ। দাম-মশাই এ খবর দিতে বলেছেন তোকে। আর পরশু খেলা আছে।—শেষের কথাগুলি বলল আমাকেই।

এই ক্রিকেটের আলোচনায় মনটা বেশ সরস হয়ে উঠেছিল। পারমিশন পেয়েছি শুনেই আবার মনে পড়ে গেল, সময় নেই, সময়

নেই। আমাকে পালাতে হবে। বললাম—সে পরশুর ব্যাপার, পরশু দেখা যাবে। স্নুনু এখন আর বক্‌বক্‌ না করে নিচে যাও। একটু কাজ করতে দাও আমাদের।—সঙ্গে সঙ্গে দুই লাফে নিচে নেমে গেল স্নুনীতা। সিঁড়ি থেকে ওর গানের শব্দ ভেসে এলো—

'আমি অকাজের দক্ষিণ হাওয়া।'

না চিত্ত নয়। চিত্ত কশাস্‌। অকাজের দক্ষিণ হাওয়া সেদিন যার মনে দোলা দিয়ে গেল, সে অশোক।

সময় নেই। সময় নেই। এবারে কাজ গুছোতে হবে। পাট গুটোতে হবে। সমীরের সঙ্গে একদিন ডিটেলড আলাপ-আলোচনা দরকার। লাড়ুমামার কাছ থেকে কিছু টাকা নিতে হবে। বিন্দুসারকে যে সেণ্টারগুলো ঠিক করতে বলা হয়েছে তারই বা কি? সুস্মিতা—হ্যাঁ সুস্মিতার প্রতিও দায়িত্ব আছে বৈকি! তা ছাড়া ভেবেছি ভোলাদাকে কিছু বলব না। সে ভারটাও সুস্মিতাকেই দিয়ে যাবো। পারিবারিক সমস্যার কয়েকটা খুঁটিনাটি ভোলাদাকে না বললেই নয়। অথচ পুলিশ-অর্ডার ভায়োলেট করে এ্যাবস্কণ্ড্‌ করছি শুনলেই ভোলাদা হৈচৈ বাধিয়ে বসবে একটা। চিত্ত অশোকের ওপর সঞ্জীবকে কম্পানী দেওয়ার দায়িত্ব রইল, যতদিন না ওর মনের পুরোপুরি পুনর্বসতি হয়। ওদের বলতেই হলো অঞ্জলি-ঘটিত ব্যাপারটা—সঞ্জীবের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা—শেষ চিঠি—আপসেট সঞ্জীব—বিশদে বললাম। সঞ্জীব কিন্তু কোনদিন বলে নি। এই একটা জায়গায় ও ছিল খুবই রিজার্ভড। এমনি হয়। মানুষ তার দুর্বলতার জায়গাকে এমনি সন্তর্পনেই পোষণ করে। আমি, তুমি, রাম, শ্যাম—সবাই।

দাম-মশাইয়ের গলা শুনলাম বাইরে। নিচে নেমে এলাম। স্নুরেশবাবু—ভিক্টোরিয়া ক্লাবের প্রাণ। তার সমসাময়িকরা যদি ঠাট্টা করেন—স্নুরেশ, তোমার বড় ছেলের খবর কি? তখনই বুঝতে

হবে ক্লাবের খবর জিজ্ঞেস করছেন। ক্লাব সুরেশবাবুর প্রথম সন্তান। পুত্রের যত্নেই পালন করেছেন তিনি ভিক্টোরিয়া ক্লাবকে।

—ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে কয়ে তোমার একটা পারমিশন করিয়েছি। ক্লাবের খেলার দিনে তোমার মাঠে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে পুলিশ। এই নাও পুলিশ-পারমিশন।

এস. পি-র সই করা অনুমতি-পত্রটা দিলেন আমাকে।

—আজ কিন্তু খেলা আছে। সাড়ে-দশটার মধ্যে পোঁছে যেও।

—প্র্যাকটিস নেই যে একেবারে।

—তা হোক, তুমি এসো।—চলে গেলেন তিনি।

সুনীতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি সুনু যাবে নাকি খেলা দেখতে ?

—বারে, নিশ্চয়। একা কেন, সবাই যাবো। কিরে সুজু, যাবি তো ?

সুনীতার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সুস্মিতাও রাজী হলো।—তোমার ভাল না লাগলে একটা রিক্সা করে চলে আসবে।—সুনীতার অকাট্য ওকালতিতে সুস্মিতা রাজী হল যেতে।

যাবার জন্য তৈরি হয়েছি আমরা। এমন সময়ে অশোকের বাড়ির দারোয়ান এলো এক চিঠি নিয়েঃ

অমল, পুলিশ-পারমিশন পেয়েছিস নিশ্চয়। মাঠে যাস কিন্তু। সুনীতাকে নিয়ে নিস। ও বারবার বলছিল খেলা দেখবে বলে। তা ছাড়া মেয়েরা তো আসে না বড় একটা খেলা দেখতে—একটু ইমপেটাস পাওয়া যাবে।—অশোক।

অখণ্ড মনযোগে খেলল সেদিন অশোক। পটপট উইকেট পড়ল। অশোক অটল। ডাইনে বাঁয়ে সমানে পিটিয়ে গেল নিরুদ্বেগ কনফিডেন্সে। ইমপেটাস পেয়ে থাকবে। আর অবাক হলাম।

সত্যি। সুনীতা বোঝে ক্রিকেট খেলাটা। প্রত্যেকটি মারের নাম বলে গেল মারের সঙ্গে সঙ্গেই। চিত্তকে ধমকালো।—ক্রস্‌ব্যাটে মারতে গেলেন কেন লেংথের বলটা ?

খারাপ খেলে এমনি মেজাজ খারাপ ছিল। তার ওপর একটি মেয়ের মাস্টারীতে চটে গিয়েছিল চিত্ত। উত্তর করল না।

আমায়ও বলতে ছাড়লো না সুনীতা।—প্র্যাকটিশ নেই তো নামেন কেন মাঠে ?

—ভাবলাম, প্র্যাকটিশ ছাড়াই তোমাকে দেখিয়ে দি একহাত। —হেসেই আমি বললাম।

—খুব দেখিয়েছেন।—মুখ বাঁকালো সুনীতা। আর অশোক আসতেই ওকে বলল।—ইউ হ্যাভ আর্নড এ টি। আজ সন্ধ্যায় চায়ের নেমন্তন্ন রইল।

অশোক চিত্তকে বলল, তুই বলটা ঐ রকম ক্রশ করলি কেন ?

সুনীতা নাছোড়, বললে, না হয় আপনি আজকের হিরোই হলেন, তাই বলে আমার কথা কানেই উঠল না ? আমি যে অত করে চায়ের নেমন্তন্ন করলাম।

প্যাভেলিয়ানের ওকোণ থেকে আস্তে কাকে যেন বলতে শোনা গেল—হিরোইনটি কে রে ?

অশোক যে এ্যাটনসন দেয় নি। চিত্তর সঙ্গে কথা বলল, সুনীতার কথার উত্তর না দিয়ে। সেও একারণেই। কে যে কি আওয়াজ দিয়ে বসবে—বলা তো যায় না। সেফ সাইডে থাকাই ভালো। বলল —নিশ্চয়ই যাবো। তারপর চলে গেল ঐ কোণের দিকে। ওকে বলতে শুনলাম, দেখ, আওয়াজ-ফাওয়াজ দেবে না। আমি, অমল, চিত্ত ওদের নিয়ে এসেছি। এখানে মেয়েরা খেলা দেখতে আসে না কেউ, তবু। আওয়াজ-টাওয়াজ দিলে কিন্তু ভাল হবে না, বলে রাখলাম।

সিকস্ ডাউন, একশ বাষট্টিতে ছেড়ে দিলাম আমরা। অশোক নট আউট পঁচাত্তর করল।

দাম-মশাই জিজ্ঞেস করলেন—কি হে অমল, এমন হলো কেন ? বল করবে তো ?

—করবো না? এত কষ্ট করে পুলিশ-পারমিশন আনলেন আপনি, প্রথম দিনেই পুরোপুরি নিরাশ করি কি করে ? ব্যাট করা তো হলো

না। দেখি, বোলিংয়ের মাহাত্ম্যে নিজেকে দামী করে তুলতে পারি কি না!

ছটা উইকেট নিল চিত্ত সতেরো রানে। বাকী চারটা নিলাম আমি। রান দিয়েছিলাম সে অনুপাতে অনেক—পঞ্চাশ। হেরে গেল ওয়ারী। ওয়ান্‌ডে ম্যাচ। ডিসিশনও হয়ে গেল। চুয়াত্তর করল ওরা সবমোট। আর সুনীতার আগ্রহাতিশয্যে চিত্ত, অশোক চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে এলো। আমরা একসঙ্গেই এলাম সবাই। মাঠ থেকে সোজা আমাদের বাড়ি।

—ওদের টু ডাউন ব্যাটটা সত্যি ভালো ব্যাট—বলল সুনীতা।

—এ তল্লাটের সেরা ব্যাটস্‌ম্যান। খুব নিয়েছে ওকে চিত্ত।—উত্তর করল অশোক।

—এ তো একেবারে বলে কয়ে নেয়া। গ্যালির লোকটাকে সরিয়ে যেভাবে মাঠ সাজালেন আমাদের আলু-ভাতেদা—চিত্তর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সুনীতা—চটছেন?

—কি হচ্ছে, সুনু?—সুস্মিতা ওকে শাসন করল।

আর এই শাসন করতে গিয়েই মুস্কিল করল—অর্থাৎ নিজের মুস্কিল ডেকে আনলো সুস্মিতা।

—জানো অশোকদা, দিদি কিন্তু কিচ্ছু বোঝে না খেলার। অমলদা যখন ব্যাট করছিল-না ওদের ঐ লম্বা মতন ফাস্ট বোলারের এগেন্সটে, দিদি আমায় চুপি চুপি বললে—একটা লেগে গেলে কি হবে!—বোকা কোথাকার!

চকিতে চোখাচোখি হলো সুস্মিতার সঙ্গে। সুস্মিতা সুনীতার কথার উত্তরে বলল, বুঝি না-ই তো। তাতে কি হয়েছে? আমি কি যেতে চেয়েছি—তুই তো টেনে নিয়ে গেলি আমায়।—অশোক চিত্তর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝিও না ইণ্টারেষ্টও পাই না। তবু যেতেই হয়। কলকাতাতেও এমনি করে। ক্রিকেটের নামে একেবারে পাগল।

সুজু একটু মন-মরা। ওর ঠিক আসে না ক্রিকেটটা। ও জানে

না কোনটা গ্যালি কোনটা স্লিপ আর কোনটাই বা সিলি-মিড-অন্। বলে, সবটাই সিলি। যে খেলায় অত মাথা খাটানো সে আবার খেলা কিসের? তবে আর সতেরোর প্রব্লেমে আপত্তি কি? বসে বসে আঁক কশলেই হয়।

—ঠিকই তো। আমরা হাসি।

—ক্রিং ক্রিং। ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

বীরেন এসেছে। ভোলাদাকে বললাম, এখানে ডাক ওকে।

কল্যাণীর চিঠি পেয়েছি আজ। এইজন্যেই বীরেনকে দরকার। খবরও পাঠিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সেইজন্যই এসেছে বীরেন। কিন্তু বীরেন ঢুকেই বলল, রায়ট লেগে গেছে, তোদের খবর দিতে এলাম।

—কেন, হঠাৎ?

—এর আবার হঠাৎ কি? তুই যে অবাক করলি। নতুন নাকি ঢাকায়?

—রেজাল্ট কি?—প্রশ্ন করল চিত্ত।

—সিক্‌স্ অল্ চলছে এদিকে। গ্যাণ্ডেরিয়ার ওদিকের খবর জানি না।

এই যে এত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে এসব আলোচনা করে ওরা, এইটেই বড় বিশ্রী লাগে আমার। ছয়জন করে বারোটা মানুষ—নির্দোষ মানুষ মারা পড়েছে আর য়ুনিভার্সিটিতে পড়া কয়টি সুস্থ-মস্তিষ্ক যুবক সেটাকে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করছে—কি করে পারে ওরা? অভ্যাস? দেখতে দেখতে এমন সহজ হয়ে গেছে যে মানুষের মৃত্যুও আর মনকে তেমন করে নাড়া দেয় না। অথচ রায়টে মারা পড়ে কারা? নির্দোষ পথচারী। যারা জানেও না হয়ত, যে একদল হিন্দু আর একদল মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে মারবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

বীরেনকে বললাম—তুই যাবি কি করে বক্সী-বাজার?

—না, বাড়ি যাবো না আজ। সঞ্জীবের বাড়িতে থেকে যাবো। বলে এসেছি ওকে।

—অমল—।

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। জিতেনদার গলা। এ কণ্ঠস্বর কখনো ভুল হয় না। আর এমন করে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি যে ওরাও সবাই এলো আমার পিছু পিছু।

—যে করেই হোক এ দাঙ্গা বন্ধ করতেই হবে। আমাদের সম্ভাব্য আন্দোলনকে এমন করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার তলে তলিয়ে যেতে দেবো না। এ সরকারের কারসাজী। এ সরকারের সৃষ্টি। সাধারণের দৃষ্টিকে এই করেই ভুলিয়ে রাখতে চায় ওরা। ডাইভার্ট করতে চায়। এ শয়তানী বন্ধ করতে হবে। ঢাকা-হলে যেতে হবে। মুসলিম-হলে যেতে হবে। সব ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তারপর দল বেঁধে হিন্দু পাড়ায়, মুসলমান পাড়ায়, একসঙ্গে যেতে হবে হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা মিলে। বোঝাতে হবে। দরকার হলে গুণ্ডামীর বিপক্ষে গুণ্ডামীও করতে হবে। কিন্তু রায়ট চলবে না। আমাদের সব আশা ভরসা তবে ঐ রায়টের তলায় তলিয়ে যাবে।

অতি সাধারণ কথা। কিন্তু ওঁর বলবার মধ্যেই কি একটা মাদকতা, কণ্ঠে কি যে দৃঢ়তা—যেন পাগল করে দেয়।

বললাম—বসুন, আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি।

অস্থির পদে ঘরময় একবার পাইচারি করে বললেন, বসতে পারছি না আমি—।

—কিন্তু, আপনি এখানে এসময়ে আসা ঠিক হয়েছে কি? যদি পুলিশ—

বীরেনকে থামিয়ে দিয়ে অসহিষ্ণু জিতেনদা বলে উঠলেন—যদি আমি না চাই, এমন কোন শক্তি নেই যে আমায় এ্যারেস্ট করতে পারে। তোমাদের সেজন্যে ভাবতে হবে না। যা বললাম, তোমরা তার বন্দোবস্ত কর।

—আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। আপনি বসুন।

—শোন, আধঘণ্টায় তুমি আসতে পারবে না। আমিও বসছি না এখানে। একঘণ্টা পরে কবরখানায় আসবে। বাছাই বাছাই

পাঁচ-ছয়জন করে হিন্দু ও মুসলমান ছেলে চাই— য়ুনিভার্সিটিতে পড়া ছেলে। আমি তাদের সঙ্গে আজ আলাপ করবো। কাল থেকে স্কোয়াড বের করা চাই-ই। পিস্ স্কোয়াড্। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হবে না। আমরা চাই না। এই স্লোগানের ওপর। আর কবরখানায় যে আমি থাকবো, কোন ছেলেকেই তা আগে বলবে না।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। যেন একটা ঝড় সবাইকার ভিত নাড়া দিয়ে গেলো। জিতেনদা চিরকাল এমনি। আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম। বলল চিত্ত। চিনত না জিতেনদাকে, বলল, এই কি জিতেন কুশারী ?

বললাম, হ্যাঁ।

—আমি কোনদিন দেখি নি, কিন্তু আজ দেখেই মনে হলো এই সেই লোক। অদ্ভুত, তারপর বলল, কেমন জানিস ? আমি এলাম। আমি দেখলাম। আমি জয় করলাম। তোদের ঐ কবরখানা-যাওয়ার দলে আমিও আছি। সত্যি অদ্ভুত, আরেকবার শুনি কি বলেন।

শুধু চিত্তই নয়। অভিভূত হয়েছিল সুস্মিতা, সুনীতা, এমনকি সুজাতা পর্যন্ত। আমি, অশোক, বীরেন আগেই চিনতাম ওঁকে।

ঠিক হলো বীরেন আর অশোক সাম্সুদ্দীনের কাছে যাবে। আর চিত্ত সমীরের বাড়ি হয়ে যাবে ঢাকা-হলে। তারপর মিট করবে কবরখানায়। আমি যাবো না। যদি জিতেনদা বলেন তবে ওরা পরে খবর দেবে।

সমীরকে ইনটার্নমেন্ট-অর্ডার সার্ভ করেছে। সমীরকে নয়, সমীরের বাড়ির দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেছে পুলিশ। কারণ সমীরকে পাওয়া যায় নি, তার আগেই সমীর এ্যবস্কণ্ড্ করেছে। ভেবেছিলাম কদিন পরেই যাবো। কিন্তু আর দেরি করা নিরাপদ নয়। রায়ট থেমে গেছে। তুদিন ছেলেদের জয়েণ্ট স্কোয়াড বেরিয়ে ছিল।— অদ্ভুত কাজ হয়েছে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান সবাই তুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছে, দোয়া করেছে। বলেছে, তোমরা বেঁচে থাকো

বাবারা। দাঙ্গার বীজ আমাদের মনে মরে ভূত হয়ে যাক। কিছু কিছু গুণ্ডা, কোন কোন গুণ্ডার দল অবশ্য প্রথমটা বেগ দিয়েছিল। কিন্তু সম্মিলিত যুবশক্তির কাছে তারাও হার মেনেছে অবশেষে।

মিঃ সেন সেই যে এসেছিলেন, এসেই চাটগাঁ চলে গেছেন। কাল ওঁর ফেরার কথা। পরশু কি তারপর দিন আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন। এর মধ্যেই আমাকেও পালাতে হবে। মিঃ সেন যতদিন আছেন আমায় এ্যারেস্ট করবে না, এটা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরই বোধহয় শ্রীঘরের বন্দোবস্ত ঝুলে আছে ভাগ্যে। না, আর দেরি করা নয়। রাতের কাজগুলি আজই সেরে ফেলতে হবে। ক্লাব থেকে খেলার খবর দিয়ে গেছে। কাল খেলা। ঠিক করলাম যাবো না। অশোককে বলেছিলাম তাই। কারণটাও বললাম চোখের ইসারায়।

সারাদিন কাজ করছি। মিসেস সেন কদিন থেকেই অসুস্থ। সুনীতা ও সুজাতা অশোকের সঙ্গে খেলা দেখতে গেছে। সুস্মিতা কয়েকবারই এসেছে ওপরে। কিন্তু আমার গাম্ভীর্য দেখে আর কথা পাড়তে পারে নি। চলে গেছে, আবার এসেছে, ফের চলে গেছে। প্রায় ছ-সাতবার ওপরে এসেছিল ও। আমার নিজেকেই এত দুর্বল মনে হচ্ছিল যে সুস্মিতার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই, মনে হলো ভেঙ্গে পড়বো। তাই গাম্ভীর্য দিয়ে আলাপ করার সুযোগ থেকে দূরে রাখলাম নিজেকে। অবশেষে ওকেও যা বলবার একটা চিঠিতে লিখে রাখলাম। বিকেলে ও আবার এলো।

—চা খাবে এখন ?

—হ্যাঁ।

—নিচে যাবে ?

—এখানে পাঠিয়ে দাও।

—আজই চলে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—আমায় কিছু বলবে না ? যাওয়ার আগে বলবে বলেছিলে।

—এই চিঠিটা রাখো। কাল সকালে খুলবে। আমার যা বলার এইতেই লেখা আছে।

দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর চিঠিটা নিয়ে নেমে গেল আস্তে আস্তে।

কষ্ট তো আমারও হচ্ছিল, কিন্তু দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে কেন এ সময়ে? মনে মনে কঠিন হলাম। আবার এলো সুস্মিতা। চায়ের কাপ হাতে। চা-টা নামিয়ে রেখে আঙুল ডুবিয়ে দিল আমার চুলের অন্ধকারে। ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম, আমি কাজ করছি। তুমি এখন নিচে যাও।

—পারছি না যে। কতবার তো গেলাম। কিন্তু—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুস্মিতা।

—আমি তো পারছি!—

—না—না—না—। আমি তো বাধা দিই নি, আমি তো যেতেই দিয়েছি। তবু কেন—না—না—না—।

কি না? কি বলতে চেয়েছিল সুস্মিতা? বলতে পারে নি কিন্তু। অব্যক্ত ব্যথায় ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। মাথা নেড়ে বলেছিল, না—না—না—। আর এই সময় কলরব করতে করতে খেলার মাঠ থেকে ফিরে এল সুনীতা, সুজাতা, অশোক। সুস্মিতাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে আমিই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম।

সেদিন খাওয়ার টেবিলে সুস্মিতাকে দেখলাম না। কোন ছুঁতো করে ওপরে উঠে আসে নি আর। তবু সেদিন রাত দুটোর সময় নিজের বাড়ি থেকে নিজেই যখন চুপিচুপি পালিয়ে আসছিলাম, গেট পেরিয়ে একবার পেছনে না তাকিয়ে পারি নি তো। ঘরের বাতি নেবানো ছিল। আবছা আবছা চাঁদের আলো পড়েছিল জানালায়। সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে দেখেছিলাম, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে সুস্মিতা। আমার সুস্মিতা।

যে আমায় বাধা দেয় নি। যে আমায় যেতেই দিয়েছে। সুস্মিতা বলেছিল, 'না—না—না—। আমি তো বাধা দিই নি। আমি তো

যেতেই দিয়েছি। তবে? না—না—না।' কি না? কি বলতে চেয়েছিল সুস্মিতা? কোনদিনই হয়ত আর জানা হবে না। হয়ত আর কোন দিনই শোনা হবে না।

না—না—না—। সমস্ত মন জুড়ে এ কথাটাই ছিল শুধু। সেদিন সেই থেকে আর কিছু ভাবতে পারি নি।

রেলক্রসিং পেরিয়ে খানিকটা এগোলেই ডাকবাংলো। আর ডাকবাংলো পেরোলেই রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে দেওদার ছায়া-ঘন ছায়ায় ছায়ায় য়ুনিভার্সিটি পেরিয়ে দূরে দূরে চলে গেছে নীলফামারীর দিকে। আর ডাইনে খেলার মাঠকে আরও ডাইনে রেখে, এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। বাঁয়ে শান্তিনগর ডাইনে কায়েতটুলি আরো এগিয়ে আমায় পৌঁছতে হবে সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরীতে থাকে পল্টুদা। পল্টুদার বাড়িতেই যেতে হবে আমাকে। সেখানে সমীর আছে। সুধাময় আসবে শেষ রাতে—সাড়ে-চারটায়। আমাকেও তার মধ্যে পৌঁছতে হবে। ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই আমাদের পৌঁছান চাই নিরাপদ আস্তানায়। জিতেনদা বলেছিলেন—দেখ, কেউ যদি একটু সতর্ক থাকে পুলিশের সাধ্য নেই তাকে ধরতে পারে। আমি সাতবছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু করি নি কি? অথচ এখানকার প্রত্যেকটি পুলিশ অফিসার আমায় চেনে। প্রত্যেকটি কনেষ্টবলের বুকপকেটে আমার ফটো আছে। ধরতে পেরেছে কি? তবে সতর্কতা একটু দরকার বৈকি।

ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছলাম। সুধাময় বলল, জিতেনদা আসবেন দেড়টা থেকে দুটো'র মধ্যে। বলেছেন কেউ যেন ঘর থেকে না বেরুই, একটু গ্রাম গ্রাম জায়গা তো। বাইরের এতগুলো লোক এখানে আছি এটা জানান দেওয়া ঠিক হবে না। ফাইনালি একা সমীরই থাকবে এখানে। আমাদের অন্য আস্তানা দেখতে হবে।

বিন্দুসার ঠিক করেছে তিন-চারটে জায়গা। খুব নিরাপদ শেল্টার। দুপুর রোদে ভাজাভাজা হয়ে জিতেনদা এলেন। তাঁকে জানালাম বিন্দুর শেল্টারগুলির কথা। তিনি বললেন, বেশ ভালো। কিছুদিন কোন কাজ নয়। শুধু লুকিয়ে থাকা। পুলিশের তৎপরতা কমুক। বেমালুম ভুলে যাক ওরা। তারপর নির্দেশ পাবে।—আর সেইদিনই

রাত করে এসে উঠলাম মনতোষিণী মাসীর বাড়ি। মহাভারতের একদা-রক্ষিতা এককালের অনেকের মন-তুষ্ট-করা আজকের বৃদ্ধা মনতোষিণী মাসী। এ বাড়িটা ছিল জাহ্নবীর। অপূর্ব নিতম্বের অধিকারিণী মহাভারতের 'ইস্কাবনের টেক্কা'। মহাভারত বলেছিলেন, অমন নিতম্ব, এ আর হয় না। সেই নিতম্বিনী পালিয়েছিল একরামুদ্দীনের সঙ্গে। এবাড়িটা সেই থেকে মনতোষিণীর সম্পত্তি হয়েছে। এ পাড়ার নয়া বারাঙ্গনাদের মনতোষিণী মাসী। ঘনিষ্ঠতররা বলে, মনুমাসী।

সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোই। একটা লেখা শুরু করেছিলাম। মাঝে মাঝে সেইটা নিয়ে বসি। কিন্তু মন বসে না। আর পাশের বাড়ির ঐ বৃদ্ধ। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গে ওর ডাকে—না আমাকে নয়। কুপুত্র জলধরের বাপ জলধরকেই ডাকে।

—আরে হালায় জলধর। উঠ্ না হালায়। টিয়া টা যে ডাক্ পারবার্ লাগছে হোনছ্ না। দানাপানি দে। বেল্ হইছে উঠ্ এ্যালা। দানাপানি দে।

জলধর তবু ওঠে না আর কর্কশ কণ্ঠে টিয়াটা কাঁদতে থাকে।

—আরে, বাপের কুপুত্তর উঠ্ না হালায়।

আমি উঠে বসি। এবারে বোধহয় জলধরও ওঠে। কারণ বৃদ্ধের কণ্ঠ আর শোনা যায় না তারপর। এই চলে নিত্য তিরিশ দিন। অবশ্য তিরিশ দিন ছিলাম না ওখানে, যে কয়দিন ছিলাম প্রত্যহই শুনেছি। পুত্র-নির্ভর বৃদ্ধ শাঁখারী। ওটা একটা শাঁখারীর বাড়ি। শাঁখের করাত চলে দিনভর। তার শব্দ এ পর্যন্তও এসে পোঁছোয়। এই মনতোষিণীর বাড়ি, আমার আপাত আস্তানা।

এইখানেই একদিন দেখা হোলো পুঁটিমাসীর সাথে। পুঁটি আসলে মাসী নয়। মোক্ষদা-ঝিও বলেছিল, ইচা আবার মাছ। সেই মোক্ষদা যার নিজেরই তুর্নামের অন্ত নেই। যে মোক্ষদা রাতে কোনদিন থাকতো না কারো বাড়ি। এই মোক্ষদা একদা ঝিয়ের কাজ করতো কিছুকাল আমাদের বাড়ি। সেই সময়েই

ঘটেছিল কেলেঙ্কারীটা। মোক্ষদা বলেছিল, ইচাও মাছ, পুঁটিও মাসী, তলে তলে এত?—বলেই কুৎসিত ভ্রূভঙ্গিতে গালে হাত রেখেছিল।

পুঁটিমাসী আমাদের গ্রামের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতো। কিন্তু ওর বাবা ছিলেন সংস্কৃততে পণ্ডিত। অবস্থার বিপাকে এমন কত হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতের মেয়ে পুঁটিও রাঁধুনি হলো। কিন্তু আমরা বলতাম পুঁটিমাসী। ওর বাপের খাতিরে। তখন আমরা স্কুলে পড়ি। আর রান্নাঘরের দিকে টানটা ছিল সময়ে অসময়ে। আমাদের দৌরাত্ম্যে পুঁটিমাসী অস্থির। অস্থির হতেই ভালবাসতো যে পুঁটিমাসী। তাই আমাদেরও একেবারে কিনে নিলো। আমাদের বাড়িতে তখন ছেলেমেয়ে ছিল অনেক। পিসতুতো ভাই, মাসতুতো বোন, মামার শালার ছেলে—এমন করে অনেক। গ্রামের বাড়িতে স্কুল ছিল। সে স্কুল একদা আমাদেরই পূর্বপুরুষদের দেওয়া। এত যে ছেলেমেয়ের ভিড়, এইজন্য। বাড়ির ওপর স্কুল। সম্ভ্রম সমীহ আছে—অতএব—।

পুঁটিমাসীর ভাগের তালের বড়া আমরা খেয়ে সারা। পুঁটিমাসীর আমসত্ত্ব আমরা সাতভাগে সমান করে ভাগ করে খেয়ে নিতাম। কতদিন দেখেছি শুধু ডাল দিয়ে হাসিমুখে খেয়ে উঠলো পুঁটিমাসী, আমাদের দৌরাত্ম্যের ফলে!

কিন্তু ভালবাসার তো একটাই রূপ নয়। আমাদের ভালবেসে ছিলো পুঁটিমাসী আমরাও পুঁটিমাসী বলতে অজ্ঞান। কিন্তু তাইতেই খুসী হতে পারে নি পুঁটিমাসী। অঞ্জলিও পারে নি তো। অতএব বারপাঁচেক ম্যাট্রিকে ফেল করা এক মাসতুতো দাদার নামের সঙ্গে জড়িয়ে পুঁটিমাসীরও দুর্নাম রটল একদিন। কি না পুঁটিমাসী অন্তঃস্বত্ত্বা।

শব্দটার অর্থ তখনো জানতাম না। মাকেই জিজ্ঞেস করলাম—মা পুঁটিমাসী অন্তঃস্বত্ত্বা কেন? মা ধমকে উঠলেন—কে বলেছে তোমাকে এসব কথা? যাও এখান থেকে।

মোক্ষদা-ঝি ঘরে ঝাড়ু দিচ্ছিল তখন। শুনেই সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—ইচাও মাছ, পুঁটিও আবার মাসী।

মা আবার ধমকে বললেন, তুই তোর কাজে যা মোক্ষদা। এসব নোংরা আলাপ আমার পছন্দ নয়।

তার দু-একদিন পরেই পুঁটিমাসী নিরুদ্দেশ হলো। সঙ্গে সেই মাসতুতো দাদা। অথবা দাদার নিরুদ্দেশের সঙ্গে পুঁটিমাসী। কিছু দিন পরে দাদা ফিরে এলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন—পুঁটি কোথায়?

—পুঁটি? আমি কি জানি?

—তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। আর এ বাড়িতে কক্ষণো ঢুকবে না সুবীর।

—এ তুমি কি বলছ মাসী?

—কোন কথা নয়। বেরিয়ে যাও।

সেই থেকে পুঁটিমাসীর খবর জানতাম না। অবাক হয়ে গেলাম তাকে এখানে দেখে। আরও অবাক হলো পুঁটিমাসী নিজেই।

—কে, অমল না? তুই এখানে?

—তুমি, তুমি এখানে কেন পুঁটুমাসী?

—আগে বল তুই এখানে কেন এসেছিস?

ভুলটা ভাঙ্গিয়ে দিল মনতোষিণী মাসী। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, স্বদেশী রে স্বদেশী। এখানে লুকিয়ে আছে পুলিশের ভয়ে, আমি জায়গা দিয়েছি। তুই ওকে চিনিস নাকি?

তবু গম্ভীর হয়ে পুঁটিমাসী বললে, তা লুকোবার আর জায়গা হলো না তোর?

আমি আবার আমার প্রশ্নই করলাম—তুমি এখানে কেন পুঁটিমাসী?

—আমাদের এটাই তো স্বর্গ রে।

আমার চোখেমুখে কি যেন পড়তে চেষ্টা করলো। তবু সংশয় কাটে নি বুঝি। তারপর বলল, কেমন আছিস? মা কেমন আছেন? বাবা? তারপর কত খবর নিলো। ইস্তক সেই মোক্ষদা-ঝি।

কাউকে বাদ দিল না। খুঁটেখুঁটে সবার খবর নিল। আমি যতটুকু জানতাম, বললাম। পুঁটিমাসী এখানে কেন ততক্ষণে আমি বুঝেছিলাম। সব জেনেশুনে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল পুঁটিমাসীর। জিজ্ঞেস করল, কদিন থাকবি? আবার আসবো।

পুঁটিমাসীকে বললাম, কাউকে বলো না যেন, আর তক্ষুণি মনে হলো মনতোষিণীকেও এটা বলে দেওয়া দরকার। যেমন ফিস্‌ফিস্ করে বলে বসলো পুঁটিমাসীকে, আবার না কাউকে বলে বসে। আমারও দরকার আর একটু সামলে চলা। এদের সামনে বেরুনোরই বা কি দরকার আমার? কিন্তু মানুষ মানুষের সান্নিধ্য চায়। তোমার মনের মত না হলেও মানুষ তো? তাই যথেষ্ট। একা থাকতে থাকতে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি। পুঁটিমাসী কদিন পরেই আবার এলো। পর পর কদিনই এলো। আর ক্রমশ সহজও হয়ে গেলো খুবই আমার সঙ্গে। তবু বলি বলি করেও একটা কথা কিছুতেই যেন আর বলে উঠতে পারছে না।

আমিই একদিন জিজ্ঞেস করলাম অবশেষে।—কি তুমি বলতে চাও পুঁটুমাসী, বলি বলি করেও যা বলছ না।

—বাঃ এই তো লায়েক হয়েছিস। মেয়েদের মনের কথাও বুঝতে শিখেছিস বুঝি?—বলেই হাসলো। আবার বলল, বলবো রে বলবো। তোকেই বলবো।

তারপর একদিন বলেও ফেললো।

—আমার একটা মেয়ে আছে। তোরও তো ভাইঝি হয় রে। সেই মেয়েটাকে কলকাতার একটা মেয়েস্কুলে পড়তে দিয়েছি। স্কুল-হোস্টেলেই থাকে। সমস্যা আমার ওকে নিয়েই রে। কি করি বলতো? ও জানে না ওর মা কি। জানে ঢাকার সম্পত্তি থেকে ওর পড়ার খরচ চালাই আমি। যতবার কলকাতায় গিয়েছি, আসবার জন্য পাগল—কিন্তু এই পরিবেশে কোথায় ওকে আনবো। ওকে যে আমি বাঁচাতে চাই। এ জীবনের জ্বালা তো আমি জানি। ভগবান করুন যেন আমার পরম শত্তুরকেও কোনদিন না এ জ্বালা ভোগ

করতে হয়। আমার মেয়েকে আমি বাঁচাতে চাই। মানুষের সম্মান নিয়ে সে বাঁচতে শিখুক—এই জন্যেই তো স্কুলে দিয়েছি, আমার সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখেছি—কিন্তু তা কি হবে? এই তো বড়দিনের বন্ধ আসছে। লিখেছে আমি ঢাকা যাবো। আমি বাড়ি যাবো। কিন্তু কোথায় বাড়ি? তুই অনেক লেখাপড়া শিখেছিস, অনেকের ভাল করার ব্রত তোদের, আমার একটা কাজ করে দে। বল, আমি কি করি?

কি বলবো?

অঞ্জলির কথা মনে হলো। অঞ্জলি বলেছিল, আজকের নিন্দা যদি নিদারুণতর হয়ে আজকেই শেষ হতো, হয়ত আমি বাঁচতে পারতাম। কিন্তু আমার সন্তানকে কত অপরিচিতজনা যখন নির্দয় সংকেতে বলবে, এ পরিচয় হীন, এ শরদিন্দুর জারজ—তখন? তখন মা হয়ে এ অপমান কি করে সইব?

সপুত্র তাই আত্মহত্যা করল অঞ্জলি। আর পুঁটিমাসী? পুঁটিমাসীরও আজকে সেই একই সমস্যা। তারও মেয়ে পরিচয়হীনা। কিন্তু তবু পরিচয় চাই। তবু বাঁচতে হবে—বাঁচাতে হবে। পুঁটিমাসী সঙ্কল্পে অটল। যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। তবু তো উপায় পাচ্ছে না। মুহূর্তে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমার পুঁটিমাসীর ওপর। না অঞ্জলি ভুল করেছে। পুঁটিমাসীই ঠিক। তবু ওকে বাঁচতে হবে—বাঁচাতে হবে—পরিচয় চাই। স্বীকৃতি চাই।

—আমি ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি রে। তুই আমায় বুদ্ধি দে। তুই আমায় রাস্তা দেখিয়ে দে। আমার মেয়েকে তোরা বাঁচতে দে।

—তুমি আবার এসো পুঁটিমাসী। আমাকেও ভাবতে দাও। রাস্তা একটা হবেই। ভেবো না।

—ভাবিস ভাবিস, আমার জন্য একটু ভাবিস। আমি বড় দুঃখী রে।—পুঁটিমাসীর সে কি কান্না।

অখণ্ড অবসর। শুধু ঘুম আর খাওয়া, খাওয়া আর ঘুম। এরই মধ্যে আসে পুঁটিমাসী। আসে আমসত্ত্ব নিয়ে—তুই তো ভালবাসতি।

নারকেলের নাড়ু আনে রকমারী—কত ঝগড়াই না করতিস এই নিয়ে। স্নেহের এ টুকিটাকি। ঐ তো একমাত্র বৈচিত্র্য আপাততঃ।

এত অবসর, আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কোন নির্দেশ আজও পাই নি যে। নির্দেশের অপেক্ষায় কাল গুণি।

একদিন লাড়ুমামা এলেন ভরতপুরে। কথা ছিল লাড়ুমামা কিছু টাকা আমায় পৌঁছে দেবেন। তাই এখানকার ঠিকানাটা বিন্দুসার মারফৎ ওকে পাঠিয়েছিলাম। লাড়ুমামা বললেন—বুঝ্‌লা, নিশীথ দারগা আইছিল একদিন—ডি. আই. বি.-র, নিশীথ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর। কয়, তোমার খবর নি জানি আমি, ধরাইয়া দিলে মোটা টাকা দিব, লোভ দেখায়। আমি কইলাম, পাগল হইছ্যান্ দারগা সাব্। আমি কি রাজনীতি করি? অগো লগে আলাপ আছিল—এই পর্যন্ত। তাই বইলা অরা কি আমারে ওগো দলের খবর কইব? কই গেছে, ক্যান গেছে আমি কেম্‌নে জানুম্। ভাললোক ঠাওরাইছ্যান্ আপ্‌নে।

লাড়ুমামাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল অন্যকথা। লাড়ুমামাকে যদি রাজী করান যায়। যদি তার বাড়িতে জায়গা দেন লাড়ুমামা। তবে পুঁটিমাসীকে এখান থেকে সরানো যায় কি? রাজী হবে কি পুঁটিমাসী এই জীবন ছেড়ে দিতে? রাজী হয়তো হলো। কিন্তু মানিয়ে নিতে পারবে তো? পুঁটিমাসীর সঙ্গেই আগে আলাপ করা দরকার। লাড়ুমামাকে বললাম—কবে চলে যাবো কিছু ঠিক নেই লাড়ুমামা। তবে আরো একটা জরুরী কাজ আছে। আর আপনাকেই করতে হবে সেটা। কাজটা অবশ্যি একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দিন দুই-তিন বাদে আরেকবার আসুন, বলবো আপনাকে।

পুঁটিমাসীর সঙ্গে সেইদিনই আলাপ করলাম। পুঁটিমাসী রাজী হলো, তবু বলল, কিন্তু টাকা? আমার মেয়ের পড়াশোনার টাকা কে জোগাবে?

—সে ভার আপাতত আমার।

রাজী হয়ে গেল পুঁটিমাসী।—তবে তো বেঁচে যাইরে—হেসে বলল।

তাই ঠিক হলো। অনেক ভেবে দেখলাম, লাড়ুমামাকে সব বলাই উচিত হবে। সব বলেকয়ে—তারপর যে করে হোক রাজী করাতে হবে লাড়ুমামাকে। লুকোচুরি করে—রেখে ঢেকে বলায় ভবিষ্যতে কম্‌প্লিকেশন্‌স্‌ ডেকে আনতে পারে। একটু মিথ্যার আশ্রয় তবু নিলাম। বললাম, পুঁটিমাসী আমার দূর সম্পর্কের হলেও মাসীই। সব শুনে লাড়ুমামা বললেন—ত্যাখ, আমার কি? আমার সাতকুলে কেউ নাই। আমি বইন বইলা চালাইয়া দিতে পারুম। পরে না কোন ফ্যাক্‌ড়া বাজে। এই কথা ভাইব্বা ত্যাখ্‌।

ভাবার কিছু ছিল না। ভেসে যাওয়া মানুষ তৃণকেই ভরসা মনে করে—আর এতো শালকাঠ। এ নির্ভর আমি জানি পুঁটিমাসীর পক্ষে নিতান্তই নির্ভয়। পুঁটিমাসীর পুরো দায়িত্ব তো নিলেনই, এমনকি যতদিন না আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মেয়ের পড়ার খরচও জোগাবেন বলে গেলেন।

কত লোক কত কথাই বলে। দলের আধা-দাদারাও কতজনে কত উপদেশ দিয়েছে কতদিন। লাড়ুর সঙ্গে মিশিস কেন? ও ছেলে ভাল নয়, একটা পাঁড় মাতাল, ওর সঙ্গে এত ঢলাঢলিটা কিসের? আরো কত?

কিন্তু এই লোকটির মনের মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি—করতে পেরেছি। নিঃস্বার্থ এমন কাজের ধকল নিজের ওপর কে সেধে নেয়? এমন মহৎ মন কটা পাওয়া যায়? তাই না বারবার ওর ওপর জুলুম করেছি। সাধ্য অসাধ্য কত কাজ চাপিয়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি।

তাই ঠিক হলো। আর আমি আসার কদিন আগেই একদিন লাড়ুমামা এসে পুঁটিমাসীকে নিয়ে গেলেন।

—দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই। আমার কাছে লজ্জা নাই। আপনার মনে কইরা চইলো। তবেই আমি খুশী।

তাইতো, অদ্ভুত মিলে গেছে তো! লাড়ুমামা আর পুঁটিমাসী। আমার সুবাদে ওরা ভাই-বোনই বটে।

ওরা ভাই-বোনে চলে গেল। তার দুদিন বাদেই আমিও চলে গেলাম কলকাতায়। আপাততঃ আমার ওপর তাই নির্দেশ।

কলকাতা এসেই দেখা করলাম মণির সঙ্গে। মণি বললো, পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না রে, তোদের তো নয়ই, আমারও না।

—কেন?

—আমাকে আসানসোলে যেতে হবে। কলিয়ারী এলাকার ভার নিয়ে।

—বেশ হয়েছে। আমরা দিচ্ছি না পরীক্ষা, আর তুই ড্যাং ড্যাং করে পাশ করে যাবি এও কি হয়? তোর জন্যে কল্যাণীটার পর্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া হবে না হয়ত।

কল্যাণীর ব্যাপারটা বিশদে বললাম। ওর প্রতি কল্যাণীর দুর্বলতার কথা, শেষ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে ঝগড়া, কলকাতা আসা, মাস্টারী—কিছুদিন আগে যে কল্যাণী আমায় চিঠি লিখেছিল সেকথাও বললাম। কল্যাণী লিখেছিল পরীক্ষা দিতে চায়; আমি যেন বন্দোবস্ত করে রাখি। সে চিঠিতেও ঠিকানা জানায় নি। লিখেছিল পরের চিঠিতে জানাবে। কলকাতারই একটা স্কুলে মাস্টারী করছে ও। বীরেনকে কল্যাণীর পরীক্ষা দিতে যা যা দরকার সমস্ত করতে বলে এসেছি অবশ্য।

এতদিন পরে দেখা, দুজনে বেরিয়ে কত ঘুরলাম। কত কথা, তবু ভুললে চলবে না, আমি এ্যাবস্কণ্ড করে আছি। তারপর এক সময়ে চলে এলাম।

আরো একটা কাজ বাকী। পুঁটিমাসীর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুটি জিনিষ মনে রাখতে হয়েছে। একটা পুঁটিমাসীর ভালো নাম, নিভাননী দেবী, আর একটা পুঁটির মেয়ের বাবার নাম—৺সুবীর

বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সুবীরদা তো বেঁচে! বলেছিলাম, সে কি পুঁটিমাসী ?

—হ্যাঁ রে, তাই। উপায় ছিল না আমার। মেয়েকে আমি কি করে বোঝাবো ? তাই বলেছি তোর বাবা নেই, বলেছি আমি বিধবা। তা ছাড়া আমার কাছে ও মরেই গেছে।

জীবিত ৺সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম একদিন স্কুল হোস্টেলে।

দারোয়ান বলল, আজ ভিজিটিং ডে নয়, দেখা করতে হলে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পারমিশন লাগবে।

বললে, পার্‌মিশোন্ লাগবে পার্‌মিশোন—দু হাতে খৈনির তদ্বির করতে করতে চোখের ইসারায় সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই দেখা হয়ে গেল কল্যাণীর সঙ্গে।

—তুমি কোত্থেকে ?

হেসে বললাম, তোমার সঙ্গে নয়, তোমার হোস্টেলের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তবে পৃথিবীটা বড়ো ছোট কিনা—

—ও—কল্যাণী লজ্জা পেল।

—ও, কি! তুমি তো ঠিকানা দাও নি যে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। এদিকে তোমার বাবা আমাকে তাড়া দিচ্ছেন, দাও ঠিকানা, বলো কি খবর মেয়ের—তাঁর তো ধারণা যে আমিই চুটিয়ে প্রেম করছি তোমার সঙ্গে।

—মুখে বুঝি আর কিছু আটকায় না—তারপর দারোয়ানকে ডেকে বলল, এই ডাকতো সুভদ্রাকে। আমাকে বললে, কথা সেরে নাও ওর সঙ্গে আগে। স্কুলের সময় হয়েছে। আমার তাড়া নেই, আমার সঙ্গে পরে গল্প করো। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তো আর দেখা করতে আসো নি।

—আসি নি-ই তো।

এল সুভদ্রা, বলল, মা লিখেছেন আপনার কথা। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, ওর জন্য আনা বই, লজেন্সের কৌটো দিলাম। খুব খুশী হয়ে বলল, আবার কবে আসবে? বিকেলে এসো বেড়াতে যাবো। আমার কাছে কেউ আসে না। কি যে খারাপ লাগে। আসবে তো? কবে আসবে? বলো না?—একদিনেই আপনার করে নিল।

—আসবো আর একদিন। বিকেলেই আসবো, বেড়াতেও নিয়ে যাবো।

—কি মজা। কোথায় যাবো আমরা?

কল্যাণী বলল, স্কুলের সময় হয়েছে। আপাততঃ তো স্কুলে যাও।

সুভদ্রা চলে গেলো। আমি যেন নিশ্চয় আসি, যাওয়ার আগে আর একবার তাড়া দিতে ভুললো না। কল্যাণীকে বললাম, বলো এবার তোমার কি খবর?

—আমার আবার খবর কি?

—যে জন্য কলকাতা এলে—

অন্যমনস্কতায় চুপ করে রইল কল্যাণী। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ভেবেছিলাম কলকাতা এলে একদিন না একদিন দেখা হবেই ওর সাথে। ট্রামে, বাসে, কিংবা কোন রাস্তার মোড়ে—। তুমি বললে, পৃথিবীটা ছোট, কিন্তু এই কলকাতা কি তার চেয়েও বড়? কেন দেখা হলো না অমলদা?

—দেখা করবে নাকি? বন্দোবস্ত করবো তার?

—তোমার এই দালালীর অভ্যাস ছাড়ো তো। আমার জিনিষ আমাকেই খুঁজে নিতে দাও। একবার তো করেছিলে, ফল কি হলো?

নৈবেদ্যের গল্পটা ওকে বললাম।

ও বলল—হ্যাঁ, আগে একটা দারোয়ান ছিল, সেইটার অভ্যাস ছিল ঐ রকম। কত মেয়ের বই চুরি করেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে ওটাকে। রেস খেলতো লোকটা। শুক্রবার হলেই মেয়েদের স্কুলের সময় বই চুরি করতো। একদিন ধরা পড়ে গেল। আমারও কটা

বই চুরি করেছিল বৈকি। যাক 'নৈবেদ্য'টা ফেরৎ পাওয়া যাবে তবে।

—যাবে?

—যাবেই। আমার এ সাধনা, এ কি বিফল হবে? আমি যে মরে যাবো তবে। অমল দা রে আমি যে তবে মরে যাবো।

এত স্পষ্ট করে, অমন করে আর বলে নি কল্যাণী। মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, হে ঈশ্বর, সত্য হোক, সফল হোক ওর সাধনা।

সুভদ্রাকে বলেছিলাম আবার যাবো। যাওয়া হয় নি। কল্যাণীকেও বলেছিলাম, দেখা করবো আর একদিন, কিন্তু পারি নি।

আগস্ট মাসে শুরু হবে বিপ্লব। ব্যাপক প্রস্তুতি দরকার। সময় নেই। সময় নেই, কর্মী নেই, অতএব এইসব ছোটখাট ব্যাপারগুলি ছাড়তে হলো।

কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্য একজন চৌকষ কর্মী চাই। সে চৌকষ কর্মী আমিই সাব্যস্ত হলাম। আর তার কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়লাম কলকাতা। ঘুরতে ঘুরতে তারপর একদিন ফিরে এলাম আবার ঢাকায়।

সব জায়গায় ঘুরে, সব জায়গায় কাজ করতে গিয়ে কোন জায়গাতেই কিছু কাজ হবে না বলে আমার বিশ্বাস। একটা জায়গায় কংক্রীট কিছু করা দরকার। কিছুই কাজ হয় নি যাদের মধ্যে তাদের এত অল্প সময়ে কি করে সংগ্রামে নামানো যাবে। আর এক জায়গায় একবার খানিকটা কাজ করে ফলোআপ না করলে কোন লাভ নেই। অথচ ফলোআপ করবে এমন কর্মী কই? তাই আমাকে একটা জায়গায় কন্‌সেনট্রেট করতে দেবার অনুমতি চাইলাম। তাতে অন্তত এক জায়গায় কিছুটা করা সম্ভব। ঠিক হলো ঢাকাতেই থাকবো। আর ঢাকারও সবটা নয়, বেছে নিলাম বিক্রমপুর।

মালখাঁনগড়, ফুরুসাইল, আউটসাহী, সোনারঙ, বজ্রযোগিনী,

একবেল্টে আর একদিকে বাসিরা, কল্‌মা, সাঁওগা, ভরাকর—একেবারে ভাগ্যকুল পর্য্যন্ত।

ধেমুমেন থেকে মেঠানি, রামনগর, ডামাগোরিয়া—উল্কার মত ছুটে চলেছে মণি এক কলিয়ারী থেকে আরটায়।

পারো, পারো একমাত্র তোমরাই পারো। তোমাদের গাঁইতির কোপে কালো কালো কয়লার পাহাড়, যুগযুগ ধরে স্তূপাকার পাথরের ফসিল চাপে চাপে ধ্বসে পড়ে—আর টিঁকে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ? শুধু একবার সমবেত সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ো। সবল হাতে গাঁইতি ধরো।—এই সাম্রাজ্যবাদ, বিদেশী শোষণের এই ভিতহীন ইমারৎ ভেঙ্গে পড়বে, পড়বেই ভেঙ্গে।

জগদ্দল শোষণের এ পাহাড়—এর বুঝি ধ্বংস নেই, এর বুঝি শেষ নেই। এ ভয়ের ভুল ভাঙাতে হবে।

মণি ছুটে চলেছে, উল্কার মতই আগুন ছড়াতে ছড়াতে।

ছুটেছে সমীর। এ ভালো না। এ করো না। এ উচিত না। না, না, না,—এই নিষেধের বাঁধ ভাঙ্গতে হবে। হোক মন্দ, হোক অকরণীয়, হোক অনুচিত—সব ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করবো। অরাজকতা—? তা হোক। পরাধীনতার চেয়ে অরাজকতাও ভালো।

শাসনের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী এ শোষণ—চলবে না, চলবে না। বাধা নিষেধের ছেলেবেলা—শেষ হোক, শেষ হোক। সুবিধাবাদের মসৃণ পথ বিপ্লবের প্রতিজ্ঞায় বন্ধুর হোক। এসো, আজ ডাক এসেছে, এসো পরাধীন দেশের নওজোয়ান, আমরা যাত্রা করি।

ছুটে চলেছে সমীর। আজ রাজসাহী, কাল যশোর, বরিশাল মৈমনসিং চট্টলা—।

আগুন জ্বলবে। আগুন জ্বলছে।

কিন্তু এ দেশের কৃষক—অসম্ভব এদের দিয়ে আন্দোলন করানো। এদের কাছে একবেলার আশ্রয় চাও, এরা দেবে। নিজে উপোস

থেকে তোমার অন্নের সংস্থান করবে। ভালো বল, মাথা নেড়ে সায় দেবে। মন্দ বল, বলবে মন্দ বৈকি। লড়তে বলো—উঁহু সে হয় না।

দুবেলার অন্ন না থাক, পরনের বস্ত্র না থাক, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আর আছে পিতৃপুরুষের ভিটা—কে আগলাবে? আমি হতাশ হয়েছি। এত অল্প সময়ে এদের দিয়ে কিছু করানো—একেবারে অসম্ভব। বিপ্লবের আগুনে এরা তাতবে না, ঝলসে যাবে। কি করা যায়?

গোপনে জিতেনদাকে খবর দি। এই তো অবস্থা, কি করবো?

—কাজ করে যাও। ফলাফল তোমার হাতে নয়। যদি পঞ্চাশ গাঁ ঘুরে পঞ্চাশটি লোক জোগাড় করতে পারো, জেনো তোমার শ্রম বিফল হয় নি।

আরো একটা কথা বিপ্লব হবে না। সে বিরাট প্রস্তুতি কই? আর আমরা যারা নিজেদের নেতা বলছি তাদের নিজেদেরই কারু সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই তো। তাই আমি আগাগোড়া বলে আসছি আন্দোলন, 'বিপ্লব' শব্দটা ব্যবহার করি না কখনো। আমরা আন্দোলন করবো। আন্দোলনই আমরা করতে পারি। বিপ্লব—? সে বড় সাংঘাতিক, সে বড় ভয়ঙ্কর—মুহূর্তে যে সব কিছু ওলট্ পালট্ লণ্ডভণ্ড করে শাসন ব্যবস্থাকে, সমাজ ব্যবস্থাকে বেমালুম পাল্টে দিতে পারে। তার জন্য চাই ব্যাপক গণপ্রস্তুতি। চাই লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত হিংস্র জনতা। কোথা পাবো। বিপ্লব নয়, আমরা যা করতে যাচ্ছি তার নাম আন্দোলন—রেভল্যুশন নয়, মুভমেণ্ট্।

তবু হতাশ হয়ো না। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ইংরেজ বিপর্যস্ত। হয়ত এই মুভ্মেণ্টই কাজ দেবে।

হয়ত কাজ দেবে? এরই ওপর ভরসা? তারই জন্য এত? শুধু আন্দোলন? তারপর বিপর্যস্ত ইংরেজের কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেওয়া? আবার আপোষ রফা? মন খারাপ হয়ে গেল। তবু কাজ করে যেতে লাগলাম। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পাই না, প্রেরণা পাই না। আশাভঙ্গের অবসাদ মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে।

তারপর এল সেই আগস্ট। বহু প্রতীক্ষার আগস্ট। গান্ধিজী বললেন, ইংরেজ ভারত ছাড়ো। কুইট্ ইণ্ডিয়া। শতকণ্ঠ গর্জে উঠল, ছাড়ো নয়তো ছাড়াবো। সহস্র কণ্ঠ তার প্রতিধ্বনি তুলল, দুবেলার অন্ন চাই, পরনের বস্ত্র চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই।

কিন্তু লক্ষ মানুষের হিংস্র জনতা কই? মুষ্টিমেয় আমরা কজন শুধু। তবে তো জিতেনদাই ঠিক বলেছিলেন, আন্দোলনেই এর পরিসমাপ্তি। তবু চেষ্টার কসুর নেই।

তোমার ভুখার অন্ন, তোমার লজ্জার বস্ত্র। তোমার অবনমিত মনুষ্যত্ব—ছিনিয়ে নাও, দখল করো।

লক্ষ লক্ষ মণ চাল সরকারী গুদামে গুদামে পচে গলে একশা। লক্ষতর বস্তা বস্তা পচা আটা ময়দা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। তবু জনতার দুবেলার ক্ষুধার অন্ন জুটলো না।

জাহাজ বোঝাই হয়ে কোটি কোটি গজ কাপড় বিদেশের বন্দরে বন্দরে পৌঁছে গেল। আর মূক জনতা গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জাহাজ ভেসে যেতে দেখল।

একটাও গুদাম লুট হলো না, একটাও জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হলো না। জনতার এ লড়াইয়ে জনতাই পিছিয়ে রইল।

জেলে একদিন সে আলোচনাই হচ্ছিল, কেন এমন হলো? কেন আমরা হেরে গেলাম?

জিতেন দা বলেছিলেন, আমাদের আভিজাত্যবোধই আমাদের জনতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। আমরা দেশকর্মী, দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করেছি জনতা এটাই জানল, আর শ্রদ্ধাভরে দূরে সরিয়ে রাখল আমাদের। কাছে ডাকতে সাহস পেল না। আপনার করে নিল না। আর আমরাও শ্রদ্ধা পেয়েই বর্তে গেলাম। তবে আর কি? আমরা তো জয় করেছি। কিন্তু বিপ্লবের প্রস্তুতি অন্য জিনিষ। তার জন্য চাই অবিচল নিষ্ঠা। মজুরের সঙ্গে মজুর বনে গিয়ে, কৃষকের সঙ্গে সমানতালে রোদ্দুরে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ওদের সুখে, ওদের দুঃখে, ওদের আপনার করে নিতে হবে। ওদেরই একজন হয়ে যেতে

হবে। তবেই না তোমার কথা ওরা শুনবে। ভুল, ভুল—আর এ ভুলের দায়িত্ব নেতাদের—দায়িত্ব নেতৃত্বের। তোমাদের নয়। সে তর্কও আজ মুলতুবী থাক। কি হবে নিষ্ফল বাগাড়ম্বরে। কে দোষী, কার দোষ কতখানি, এ তর্ক আজ নিষ্প্রয়োজন। তবু তোমাদের বলি, তোমরা যারা আজও নেতা হও নি।

এ সংগ্রামের এখানেই তো শেষ নয়। আবার সংগ্রাম করতে হবে সেদিন যেন তোমরা আর ভুল না করো।

উঠে চলে গেলেন জিতেন দা। সবাই চুপ করে বসে রইলাম আমরা।

জেলে এসেই শুনেছিলাম, জিতেনদার সঙ্গে আর আর নেতাদের মত-বিরোধ। প্রস্তুতির বিভিন্ন ধারায় ধারায়, আন্দোলনের পরিণতি নিয়ে, কার্য-ক্রমের ক্রমে ক্রমে। আজ বুঝি সেইটাই চূড়ান্ত প্রকাশ পেল। স্পষ্ট বলে গেলেন, আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি নি। তোমরা আর আমাদের ওপর আস্থা রেখো না।

—এ ভুল করো না, এ ভুল আর করো না।—যেন শুনতে পেলাম। মনে মনে গুমরে গুমরে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন তিনি।

আমার ছমাস জেল হয়েছিল ইনটার্নমেণ্ট অর্ডার ভায়োলেট করার অপরাধে। সে মেয়াদ শেষ হতে না হতেই জানতাম নিরাপত্তা আইন কাঁধের ওপর ঝুলছে। তবু ভরসা ছিল একবার জেল গেটে নেবে। যদি পালাতে পারি। একবার মনে হয়েছে পালিয়েই বা করবো কি? কিই বা করার আছে? সমীর এখনো ধরা পড়ে নি। জেলে বসেই বা কি করবো?

তাই করলাম। পালালাম জেল গেট থেকে। সাধারণত এই হয়েছে, যাদের সাজা হয়েছে, মেয়াদের শেষে একবার করে জেল গেটে নিয়ে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করেছে আবার। আর একবার জেল গেট থেকে ঘুরে আসার প্রহসনকে মনে মনে মেনেও নিয়েছে সবাই। তাই নিশীথ দারোগা আমার কাছেও অন্যথা আশঙ্কা করে নি। আর সেইটাই ভুল করেছিল সে।

একটা খালি ঠেলাগাড়ি ছিল জেল গেটে দাঁড় করানো। হয়ত কোন জিনিষ বোঝাই হয়ে এসেছিল, নামানো হয়ে গেছে।

নিশীথ কিছু বলবার আগেই ঠেলাগাড়িটা ঠেলে ওকে ধরাশায়ী করলাম আর মুহূর্তের মধ্যে উধাও হলাম। পেট মোটা কনেষ্টবলটার চেয়ে আমি যে অনেক তৎপর এ বিশ্বাস আমার ছিল। ছিল বলেই পালালাম।

কেন পালালাম, সেদিনও স্পষ্ট হয় নি আমার কাছে। একটা অস্পষ্ট কুয়াসার মত ঝাপসা ঝাপসা ভীরু-আশা, ভীরু-ইচ্ছা মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। বাইরে যাদের মধ্যে এই এতদিন কাজ করেছি, হয়ত এতদিনে, হয়ত আমার অবর্তমানে তারা মনস্থির করেছে। কিন্তু তারা কজনা আর? একথাও মনে হয়েছে, কিই বা করা সম্ভব? তবু কিন্তু পালালাম।

রাতারাতি যে এমন প্রসিদ্ধি অর্জন করবো, এটা আমারই ধারণা ছিল না। পরের দিন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় মোটা মোটা হরফে নিজেরই পলায়নের অতিরঞ্জিত কাহিনী—কি করে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছি তারই বিস্তৃত বিবরণ পড়তে পড়তে হেসেছিলাম। অদ্ভুত শক্তি এই সংবাদপত্রের। প্রায় হিরো করে তুলেছে আমাকে। আর বিপদ হলো সেইটাই। অমন হিরোটি যে তাদের বাড়িতেই এসে উঠেছে পল্টুদার ছোট ছোট ভাইবোনেরা সেটা আর চেপে রাখতে পারছিল না পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে।

আমি সোজা পল্টুদার বাড়িতেই এসে উঠেছিলাম। পল্টুদাকে বলেও ছিলাম যেন কেউ না জানে। ঠিক করেছিলাম দু-একদিনের মধ্যেই বিক্রমপুরের দিকে চলে যাবো। কিন্তু ব্যাপার দেখেশুনে ঠিক করলাম, না আর দেরি নয়, আজই যেতে হবে।

সেদিনই সন্ধ্যার পর বেরুলাম। পল্টুদাকে ঠিকানা দিলাম আউটসাহীর। সমীর এলে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সমীর

কোথায় আছে এখন জানি না। তবে ধরা পড়ে নি। আর কাগজে নিশ্চয় আমার খবরও দেখে থাকবে। খোঁজ করবেই।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে, পথে লোক খুবই কম। জানালায় টোকা মেরে আস্তে ডাকলাম—বীরু আছিস ? লম্বা রেন্‌কোটে শরীর ঢাকা। টেনে দেওয়া টুপিতে মুখটাও ঢেকে নিয়েছিলাম—ওগুলো পল্টুদার সম্পত্তি। বীরেন বুঝতে পারে নি, বেরিয়ে এসে বলল, কে ?

—আমি অমল, একটু বাইরে আয়।

—তুই চলে আয় ঘরের ভেতর। কেউ নেই এ ঘরে।

—টাকা আছে ? কিছু দিতে পারিস ?

—বিশেষ কিছু নয়।

—একবার আমার বাড়ি যা। ভোলাদাকে বলবি, আমার কিছু টাকার দরকার।

তৎক্ষণাৎ সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বীরেন। বললাম, আমি আছি লাড়ুমামার বাড়ি। ওখানে আসিস।

ভোলাদাকে ডাকতে গিয়ে বীরেন পড়ল পুলিশের হাতে। গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ অফিসার।—বীরেন সাইকেল থেকে নামতেই ডাকলো—শুনুন, কাকে চাই ?

বীরেন চৌকষ ছেলে, বুঝে ফেলেছিল। বলল, মিস সেনের কাছে একটু দরকার—তা আপনি কে ?

—ভেতরে যান।

সাইকেলসুদ্ধ বারান্দায় উঠে দাঁড়াল বীরেন। ডাকল—মিস সেন আছেন ?

দরজা খুলে দিল জনার্দন বেয়ারা। বীরেন ভেতরে ঢুকে পড়ল, বলল, মিস সেনকে একটু ডেকে দাও তো।

সুস্মিতা এসে বলল, কি ব্যাপার ?—আঁচ করেছিল আমারই সঙ্গে জড়িয়ে কোন ব্যাপার নিশ্চয়।

গলা খাটো করে বীরেন বলল, আসলে আপনার কাছে আসি নি

আমি। অমল পাঠিয়েছে ভোলাদার কাছে। কিন্তু পুলিশটাকে তো সে কথা বলা যায় না। আপনার নামই করেছি। তাই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতে হয় যে আপনার।

—কোথায় অমল দা ?

—অত জোরে নয়, আস্তে কথা বলুন। অমল পালিয়েছে জেল থেকে।

—জানি, কাগজে দেখেছি। কোথায় আছে ? আমি দেখা করবো। সকালবেলা পুলিশও এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়ি এসেছে কি না। কোথায় আছে ও —

—ওকে বলবো। যদি রাজী হয় দেখা করতে, জানাবো আপনাকে। এখন ভোলাদাকে একটু ডাকুন।

—জনার্দনদা, ডাকতো ভোলাদাকে।

—ভোলাদা তোর কাছে টাকা আছে ? বীরেন জিজ্ঞেস করলো।

—বেশী নেই তো ?

—এক মিনিট, আসছি আমি—বলে, উঠে গেল সুস্মিতা। ফিরে এল একটু বাদেই। হাতে একটা এনভেলাপ। বললে, এইটে ওকে দেবেন—আর আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন কিন্তু।

বীরেন বলল, এক কাজ করুন, আমি চলে যাই, তুই ভোলাদা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে টাকাটা লাড়ুমামার বাড়িতে দিয়ে আয়। অমল ওখানে আছে। পুলিশ যখন একবার সন্দেহ করেছে তখন আমার পিছু নিতে কতক্ষণ। আমার আর ওখানে না যাওয়াই ভালো।

এনভেলপটা ভোলাদার হাতে দিয়ে বেরিয়ে এল ও।—অমলের সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় আমার তবে নিশ্চয়ই আপনার কথা বলবো।

—আপনি একটু দেখা করবেন ওর সঙ্গে আমারই জন্য। বলবেন খুবই দরকার।—বলল সুস্মিতা।

—আজ আমার ওখানে যাওয়া উচিত নয় আমার জন্যও ততটা নয়, অমলের জন্যই। কাল অমল কোথায় থাকবে আর শীগ্‌গীর দেখা

হবে কি না, বলতে তো পারি না। তারপর বলল, বারান্দায় গিয়ে কিন্তু অন্য কথা বলবো। আপনি যেন রেসপন্ করেন।

বীরেন সাইকেলটা নামাতে নামাতে একটু জোর গলাতেই বলল —তবে চলি। আপনার এ্যাডমিশনের ব্যাপারে আমি বলবো প্রোভোস্টকে।

—হ্যাঁ, একটু বলবেন দয়া করে।—সুস্মিতাও বারান্দা পর্যন্ত এলো।

সুস্মিতা ফিরে গিয়েই ভোলাদাকে বলল, একমিনিট দাঁড়া ভোলাদা।

সাইকেলে ওঠবার আগে বীরেন নিরীহ গোবেচারা ভাবে বলল —কার জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি ?

পুলিশ অফিসারটি ধমকে উঠল, আপনি আপনার কাজে যান।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং, বীরেন ততক্ষণে লার্মিনি স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে গেছে।

মিসেস সেন কদিন থেকে অসুস্থ। বিছানাতেই শুয়ে থাকেন সারাদিন। মুখে কোনো কমপ্লেন্ নেই, তবু বোঝা যায় সব কষ্ট নীরবে সহ্য করছেন। সুস্মিতা মাকে জানে। বুঝছে খুব কষ্ট হচ্ছে ওঁর। আর সহ্য করবার ক্ষমতা ওঁর অসাধারণ।

সুস্মিতা সুনীতাকে ডেকে বলল, আমি একটু আসছি ঘুরে। মা ডাকলে বলবি না যে বাড়ির বাইরে গেছি।

—অমলদা এসেছে ?

—এ সম্পর্কে কোনো কথা মার সঙ্গে নয়। আমি আসছি। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুস্মিতা, ভোলাদার পিছু পিছু।

—তুমি ? তুমি কেন এলে ?

—তাতে কি ?

—যদি পুলিশ ফলো করে থাকে ? ছিঃ—

সুস্মিতার মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেলাম। হেসে বললাম,

এমন করে আসতে নেই। কেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে মিছিমিছি?

—মিছিমিছি?—সুস্মিতা নিজেকেই বলল বুঝি।

—কি করে এলে? বাড়ি চিনলে কি করে?—

—ভোলাদা বাইরে আছে। ওকে একটু লক্ষ্য রাখতে বললাম রাস্তায়।

—বাঃ, একেবারে ট্রেণ্ড!

পুঁটিমাসী জিজ্ঞাসা করল, ও কে অমল?

—আমার দুর্দিনের বন্ধু। ছাখো না আমার জন্য এই প্রয়োজনের মুহূর্তে কত টাকা নিয়ে এসেছে।

সেই এন্‌ভেলপে ভরা টাকাটা সুস্মিতার হাত থেকে নিতে নিতে বললাম—কতো আছে?

—সাত শো। হবে না?

—আপাততঃ চলবে কিছুদিন।—তারপর আবার হেসে বললাম, মায়ের বাক্স ভাঙ্গো নি তো?

—না, ও টাকাটা আমারই।

—ফেরৎ পাবে না কিন্তু শীগ্‌গীর।

সুস্মিতা ম্লান হাসলো। উত্তর করল না কোনো।

—এবারে চলে যাও।

সুস্মিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কিছু বলবে?

ব্যথাতুর দৃষ্টি তুলে চাইল সুস্মিতা। তারপর মাথা নেড়ে জানালো, না। কিছু বলবে না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

—অহনে তুমিও যাও। আমারে আর বিপদে ফেলাইও না। কইতে কয় বাঘে ছুঁইলে আঠার ঘা। শালার পুলিশ একবার নজর দিলে আর নিস্তার নাই।

—হ্যাঁ চলি। পুঁটিমাসী ভাইয়ের বাড়িতে কেমন আছ?

দৃষ্টিতে যদি কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়তে পারে তবে পুঁটিমাসীর দৃষ্টিতে সেদিন সব কৃতজ্ঞতাই ঝরে পড়ে গেছে।

আর সেইদিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল লাড়ুদার মুখ। লাড়ুমামা এখানে মামা নয় পুঁটিমাসীর সে দাদা।

গয়নার নৌকায় না উঠে ভিন্ন নৌকা নিলাম। আর শেষ রাত্রে পৌঁছে গেলাম তালতলার হাটে। এখানে গ্রাম। এ আমার চৌহদ্দী। পুলিশের সাধ্য কি এখানে আমায় কায়দা করে। নিশ্চিন্তে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। মালখানগর হয়েই যাবো। দেখেই যাই এখানকার খবর কি ? নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালাম।

এখানকার মূল কেন্দ্র আউটসাহী। নিবারণ জেলের বাড়ি আপাতত সিক্রেট ক্যাম্প।

দিন তিনেক অপেক্ষা করলাম সমীরের জন্য। এল না সমীর। তারপর বেরিয়ে পড়লাম।

কলমা, ভরাকর, সাঁওর্গা। ওদিকে সোনারঙ, বজ্রযোগিনী, আব্-দুল্লাপুর, পাইকপাড়া; আবার আউটসাহীতে ফিরলাম প্রায় দশ-বারোদিন পরে। নিবারণ বললে—সমীর বাবু তো এসেছে, সঙ্গে আরো দুটি ছেলে। রমিজুদ্দীনের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করেছি।

সোজা চলে গেলাম রমিজ শেখের বাড়ি। সমীর, সুধীর, সুধাময় তিনজনেই ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্বশীল কর্মী। ভেবেছিল নিশ্চয়ই জেলের মধ্যের দাদাদের—নেতাদের কাছ থেকে বিশেষ কোন নির্দেশ নিয়ে এসেছি আমি। তিনজনেই তাই ছুটে এসেছে। সব শুনে হতাশ হলো।

জিতেনদার সঙ্গে অতুলদার, ধীরেনদার, রাখহরিবাবুর মত-বিরোধ ছিল—জিতেনদা এখনও ক্ষুব্ধ তাই নিয়ে—একথাও জানালাম।

—আমরা তো আরো শুনেছি, যে আন্দোলনের আগে নাকি অনেক টাকা উঠেছিল, কলকাতা থেকেও নাকি অনেক টাকা পাঠানো হয়েছিল। অতুলবাবু, রাখহরি বাবু নাকি সে টাকা সরিয়ে ফেলেছেন। আন্দোলনের সময়, কোথায়! সে টাকা তো পাওয়া যায় নি। এমনও শোনা গেছে যে রাখহরিবাবু নাকি নিজেই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন নিজেকেই এ্যারেস্ট করাবার জন্য। বিশ্বাস করতে

ইচ্ছা হয় না—কি জানি। তবে প্রয়োজনের সময়ে আমরা টাকা পাই নি এটাও ঠিক।—বলল সুধাময়।

—তোরা বোস্, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।—সমীর আমায় ডেকে বাইরে নিয়ে এল। বলল, জানিস না বোধ হয়, মিসেস সেন মারা গেছেন?

চমকে উঠলাম—কবে?

—বুধবারে।

—হঠাৎ! কি হয়েছিল?

—কেউ বুঝতে পারে নি। ভাল করে ডাক্তারও দেখানো হয় নি। মরবার ঘণ্টা তিন-চার আগে সুস্মিতাকে ডেকে নাকি বলেছিলেন—সুনু, সুজুকে দেখিস তুই। তুই তো বড় হয়েছিস।—ব্যস্। মিঃ সেনকে তার করা হয় মরবার পর। তিনি এসেছেন। অশোক খুব করছে ওদের জন্য। ছুটোছুটি, এই দুঃসময়ে কাছে কাছে থাকারও তো খুব দরকার। সুস্মিতার এক বন্ধু এসেছে কলকাতা থেকে। অশোকই বলল সব খবর। সম্ভব হলে একবার তোকেও দেখা করতে বলেছে।

সেইদিনই ঢাকায় এলাম। বাড়ি গেলাম না। সুরেশবাবুর বাড়ি থেকে ফোনে কথা বললাম।

—ইয়েস্? —উত্তর এল। বুঝলাম মিঃ সেন।

—একটু মিস সেনকে ডেকে দেবেন।

—হুইচ মিস সেন ইউ মিন। আই হ্যাভ গট্ থ্রি ডটার্স।

স্পষ্ট পরিহাস তরল প্রশ্ন। অদ্ভুত তো! অথবা এক একজন অমন থাকেন। যাঁরা দুঃখকে নিজের মনেই চেপে রেখে বাইরে একেবারে অন্য রকম।

—সুস্মিতাকে চাই আমি।

—বেয়ারা, মিসিবাবাকো বোলা দেও।—ওটা বোধ হয় জনার্দনকে বললেন, আমি শুনতে পেলাম। ফোনে আমাকে বললেন, প্লিজ হোল্ড-অন।

—আমি সুস্মিতা বলছি।—সুস্মিতা এসে ফোন তুলে নিয়ে বলল।

—আমি অমল।

ফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইল সুস্মিতা। অনেক—অনেকক্ষণ। তার-পর জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে বলছ ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বললাম—সন্ধ্যায় লাড়ুমামার বাড়িতে এসো।

—আচ্ছা।

—ছেড়ে দি।—ও কিছু বলবার আগেই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু লাড়ুমামার বাড়িতে সেদিন দেখা হয় নি সুস্মিতার সঙ্গে। ছোট সহর। বেলা তিনটা নাগাদ সমস্ত সহরময় রটে গেল, লাড়ুমামা একজনকে খুন করে পালিয়েছেন।

—রায়ট ?

—না, না, পাড়ার ফণী পাল।

—কি হয়েছিল ?

—বলে খুন হই আর কি ?

প্রত্যক্ষদর্শী একজনের নাম জেনে তার কাছে ছুটলাম পুরো খবর নিতে। যে কথা খুনের ভয়ে বলতে রাজী হয় নি পাড়ার ঐ ভদ্রলোক সেটা সংক্ষেপে এই রকম।

পাড়ায়—লাড়ুমামাদের দক্ষিণ-মৈশুণ্ডিপাড়ায় ফণী পাল ছিলেন গেজেট। নবাব বাড়ির রসুই ঘরে কি রান্না হয়েছে থেকে সুরু করে, ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরের কেচ্ছা পর্যন্ত নানাবিধ মনোরোচক রঞ্জিত কাহিনীর পরিবেশক তিনি। ইদানীং এই গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল যে লাড়ুমামা একটি বেশ্যা নিয়ে বসবাস করছেন। লাড়ু-মামা একদিন শাসিয়ে ছিলেন। তাতে কাজ হয় নি। লাড়ুমামা বলেছিলেন, ছাখো গেজেট—ফণী পালকে গেজেট বলেই ডাকতো পাড়ার লোকেরা—যদি আবার একথা তোমার মুখে কোনদিন শুনি, তবে—। লাড়ুমামা বলেছিলেন, তবে কাঁচা নর্দমায় পুঁতে ফেলবেন। সেই থেকে কিছুদিন চুপচাপই ছিলেন ফণী পাল। কিন্তু আজ যখন

লাড়ুমামা বাড়ি ফিরছেন সকালের টহল সেরে, নিজের কানেই শুনলেন, ফণী পাল বলছেন—ফণী পালের বাড়ি পেরিয়েই আসতে হয় লাড়ুমামাকে। ঘরের মধ্যে আরো কয়জন পাড়া-বেপাড়ার লোক, আর ফণী পাল বলছেন—লাড়ুর কথা আর কও ক্যান্? এক বাজারের ব্যাশ্যা আইন্যা বাড়িতে তুলছে—তারপর কথাটা আর শেষ হয় নি। লাড়ুমামার কঠিন কণ্ঠের ডাকে থেমে গিয়েছিলেন ফণী পাল।

—গেজেট।—ডাকলেন লাড়ুমামা।

গেজেট নিরুত্তর।

লাড়ুমামা আবার ডাকলেন—এই গেজেটের বাচ্চা, শালা ডাক শোনস্ না?

এইবার কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন ফণী পাল। আর লাড়ুমামার হাতের এক চাপড়ে ধরাশায়ী হয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। আর উঠতে পারেন নি। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে সেই যে চোখ বুজলেন, সেটাই শেষ বোজা।

মেরে ফেলার ইচ্ছা লাড়ুমামার ছিল না। কিন্তু মরেই যখন গেল, তখন না পালিয়েই বা উপায় কি?

তবু লাড়ুমামা একা পালালেন না। পুঁটিমাসীকে নিয়ে পুলিশ আসার আগেই বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে উধাও হলেন।

পরে সঞ্জীবের কাছে শুনেছিলাম। লাড়ুমামার চাকর নাকি ওর বাসায় যেয়ে বলেছিল যে লাড়ুমামা বলে গেছেন, এইটা যেন রটিয়ে দেওয়া হয় যে লাড়ুমামা দিন পনের আগে থেকেই ঢাকা ছাড়া।

তাতে নাকি কেসে ওর সুবিধা হবে। অর্থাৎ ফণী পালের মৃত্যুর সময় লাড়ুমামা ঢাকাতেই ছিলেন না। তবে মারলেন কি করে? অতএব এইটা পাড়াতুত আক্রোশ। এটাই প্রমাণ করতে চাইছিলেন বোধ হয় লাড়ুমামার উকিল।

সুস্মিতাকেও খবর পাঠিয়েছিলাম। লাড়ুমামার বাড়িতে একটা

গণ্ডগোল হয়ে গেছে—সেখানে যেন না আসে। আমিই এক সময়ে দেখা করবো পরে। তাও পারি নি।

শুধু এক লাইনের পত্রে সুস্মিতাকে জানিয়ে গিয়েছিলাম—

—বলেছিলাম, প্রয়োজনের দিনে তোমার পাশেই আমাকে পাবে। দুঃখের দিনেই বন্ধুর প্রয়োজন তো। কিন্তু আজই ঢাকা ছাড়তে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করা হলো না। অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতাকে ক্ষমা করো।—

অশোক ওদের ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করে তখন। ওর কাছেই চিঠিটা দিলাম। বললাম—এটা সুস্মিতাকে পৌঁছে দিবি, আর হেসে বললাম—উইশ ইউ গুড লাক্। অশোক এমনিতেই কম কথা বলে। কিছুই বলল না। নীরবে হাসলো। আমি আবার বললাম—দেখিস আবার সুনীতাকে দিয়ে বসিস না যেন।

এবারে অশোক উত্তর করল—যদি দিইও বা, ও ঠিক জায়গামতই পৌঁছে দেবে। তুই ঘাবড়াস কেন অত?

—না ঘাবড়াই নি।

হেসেই চলে এলাম। এমনি মানুষের মন। মিসেস সেনের মৃত্যুতে আমিও কম দুঃখ পাই নি। মহিলা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। অথচ অশোকের সঙ্গে দেখা হতেই সুনীতা সম্পর্কে ওকে ঠাট্টা করতে আজই বাধল না।

তারপর ছমাস কেটে গেল। সুস্মিতারা কলকাতায় চলে গেছে। সমীর ধরা পড়েছে। সুধাময় ধরা পড়েছে। লাড়ুমামা সেই থেকে নিখোঁজ। পুলিশও ততটা তৎপর ছিল না। রাজনৈতিক ফেরারীদের পেছনেই এত এ্যাটেনসন্ দিতে হচ্ছিল যে এসব জিনিস—এসবের ফাইল চাপা পড়ে আছে। বোধহয় ততদিন চাপা পড়ে থাকবে যতদিন না এ দেশের নিরাপত্তা এ্যাস্যুরড্ হয়। এ নিরাপত্তার জন্যই না গান্ধিজী, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল—সবাইকে জেলে পুরেছে নিরাপত্তা আইনে। লাড়ুমামারা আপাততঃ নিশ্চিন্ত।

আর ওরাও নিশ্চিন্ত যারা খুন করল, জ্যোতির্ময়কে সোমেনকে।

পার্টির দলাদলিতে শক্তি ব্যয়িত হোক এ তো সরকার চেয়েই ছিল। যারা ওদের খুন করল, যারা ওদের খুন চাইল তারা সেইচ্ছার শিকার হলো বৈকি।

অক্লান্ত কর্মী জ্যোতির্ময় ভৌমিক। একটা বিপুল সম্ভাবনা সোমেন চন্দ। মণির ভাষায় আমারও বলতে ইচ্ছা হলো 'ব্রুট্‌স্'— যারা এর জন্য দায়ী তারা নিঃসন্দেহে ব্রুট্‌স্। আর আমরা— আমরাই বা কি করলাম।

রাজনীতিতে মত-বিরোধ তো অবশ্যম্ভাবী। এবারেও বিরোধ ছিল।

কেউ বলল এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ, কেউ বলল নয়।

আমরা বলেছি এ জনযুদ্ধ নয়। রাম জেতে কি শ্যাম জেতে যদুর তাতে ক্ষতিও নেই, বৃদ্ধিও নেই। জাপানের সঙ্গে এ যুদ্ধে ভারত ইংরেজকে সাহায্য করবে না। জাপান যদি ভারত আক্রমণ করে— করবে ইংরেজের কলোনী বলেই। তবে যদি ইংরেজ আমাদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং তারও পরে জাপান ভারত আক্রমণ করতে চায় তখন আমরা নিশ্চয়ই জাপানকে প্রতি-আক্রমণ করবো। দরকার হলে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়েও। তাই সর্বাগ্রে ঘোষণা চাই স্বাধীনতার। এ যেমন একটা যুক্তি তেমনি এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ যাদের বক্তব্য তাদেরও একটা যুক্তি আছে বৈকি।

রাশ্যা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ হলো কিনা, এক কথায় এ যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যদি এমন হয়, ইংরেজ আমেরিকার সাথে রাশ্যাকেও জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করতে হয় তবে সেটা ভয়ের কথা বৈকি। রাশ্যাকে বাঁচাবার প্রয়োজন যে কোন দেশের গণ-স্বার্থের প্রয়োজনেই অনস্বীকার্য। তবে ?

তা ছাড়া আরও একটা দিক ছিল, যে এটাকেই জনযুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে যদি নিই। এই যুদ্ধে যোগ দিয়ে হাতিয়ার হাতাতে হবে। যুদ্ধের টেকনিক্ শিখতে হবে। তারপর ওদের অস্ত্রে ওদের টেকনিকে ওদেরই ঘায়েল করো। এ যুদ্ধের শেষে আরও এক যুদ্ধ। এক কথায় এ যুদ্ধটাকে আমরা ইউজ করবো সে যুদ্ধের প্রস্তুতির

জন্য। তারপর যুদ্ধে দুর্বল হয়ে-পড়া ইংরেজকে আঘাত হানো কলোনী সামলাবার আগেই।

যুক্তি দুদিকেই আছে। দুয়েরই বক্তব্য ভাববার মত। কিন্তু ওরা তা ভাবল কই?

আমার মতটা কারো অপছন্দ বলেই তাকে মৃত্যুর শাস্তি নিতে হবে এটাই বা কি রকম যুক্তি? অসহ্য—অসহ্য লাগছিল।

উঠে পাইচারী করতে লাগলাম। আর কিই বা করতে পারি!

—জ্যোতির্ময়, সোমেন, তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। তোমাদের দুজনে মতান্তর হয়তো ছিল। কিন্তু তোমাদের কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে যে মনান্তরের সৃষ্টি হলো, তোমাদের ক্ষমায় যেন সেটা আমরা একদিন ভুলতে পারি।

আন্দোলনের শিখা স্তিমিত হতে হতে প্রায় নিভে এসেছে। আর বাইরে থেকেই বা কি করবো। ধরা পড়লেও ক্ষতি কি? প্রায় প্রকাশ্যেই ঘোরা ফেরা করতে লাগলাম। একদিন এসে উঠলাম ঢাকার বাড়িতে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক পাইপ টানছিলেন। পরনে পাতলুন, গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী—বোতাম একটাও আঁটা নয়।

হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কাকে চাই?

আমিও হেসে বললাম—সেকি, এটা যে আমারই বাড়ি বলে জানতাম।

—অ্যাম স্যরি। অ্যাম স্যরি। লেট মি ইনট্রোড্যুস্ মাইসেলফ —আই এ্যম মজুমদার—আমি সেন পরিবারের বন্ধু একজন।

মজুমদার সাহেব কড়া সাহেব। সেন পরিবারের বন্ধু। আরো বিশদে বললেন ওর ছোট বোন, সুস্মিতার—আমরা যাকে বলি হরিহরাত্মা, এত বন্ধু। ওর একটা বাড়ি আছে ঢাকায় সেটা বিক্রী করতেই উনি এসেছেন। দিন সাতেক থাকবেন।

সুস্মিতাদের পরিচয়েই এখানে উঠেছেন। মিসেস সেনের মৃত্যুর সময় আরও একবার থেকে গেছেন দুদিন। এ বাড়িতেই।

শুধু মজুমদার নয়, একটু বাদেই জানলাম—ইনিই শরদিন্দু মজুমদার, বার-এ্যাট-ল, তবু সামলে নিলাম নিজেকে। অঞ্জলি সঞ্জীবকে লিখেছিল শরদিন্দুকে তোরা ক্ষমা করিস। সেজন্যেও নয়, আমার মনে হলো সুস্মিতাদের পরিচয়ে এসেছে শরদিন্দু। আমি কেন ওর সঙ্গে ঝগড়া কুড়োব? যাক যেতেই দি। যেতেই দিলাম।

কিন্তু ক্রমশই শরদিন্দুকে ইনটারেস্টিং মনে হতে লাগল আমার। সুস্মিতা সম্বন্ধে শরদিন্দুর উৎসাহ প্রচুর। কিছু কিছু নূতন তথ্যও আমায় পরিবেশন করলো শরদিন্দু। যেমন একদিন কথায় কথায় বলল, সি ইজ সুপার্ব, আই মিন সুস্মিতা। ইজন্‌ট্‌ সি?

—মেয়েদের সঙ্গে এমন কি সুস্মিতার সঙ্গেও আমার মেলামেশা এত অল্প যে বলা মুস্কিল।

—নো। দেন ইউ রিয়েলি ডোণ্ট নো হার। সি ইজ সুপার্ব। সি ইজ এ ওয়াণ্ডার।

চটে গেলাম কেন মনে মনে? হয়ত এটা হিংসা। ভাবলাম জিজ্ঞেস করি অঞ্জলিকেও কি সুপার্ব মনে হয়েছিল? অপ্সরাকে ওয়াণ্ডার? সামলে নিলাম নিজেকে। কিছু না বলে ছাদে চলে গেলাম।

আর একদিন। রাত্তিরে ছাদে বসেছিলাম একটা ইজিচেয়ার নিয়ে। পাইপ টানতে টানতে এল শরদিন্দু।

—কি দেখছো, তারা? স্টারস্‌?—বয়সের নজিরে শরদিন্দু আমায় তুমি বলতে শুরু করেছিল ততদিনে।

—না, এমনি বসে আছি।—ভোলাদাকে আর একটা চেয়ার দিতে বললাম।

—ঐটে কালপুরুষ, বুঝলে, ঐটে।—পাইপের গোড়ার দিকটা শূন্যে স্থাপনা করে শরদিন্দু কালপুরুষ চেনালো আমায়।

তারপর কোনটা স্বাতী নক্ষত্র, কোনটা সপ্তর্ষি—একদিন খুব সকালে উঠো দেখবে ধ্রুবতারা কেমন জ্বল জ্বল করে জ্বলে। পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পাল্টাল শরদিন্দু। বললে—আচ্ছা, হাউ ডু ইউ লাইক দি আইডিয়া? আই উইশ টু ম্যারি সুস্মিতা।

প্রশ্নটা আকস্মিক। তবু আমি চমকাই নি। সুস্মিতা যে শরদিন্দুর মনে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে এ আমি ততদিনে বুঝেছিলাম বলেই। কিন্তু জানার ইচ্ছা ছিল, সুস্মিতার ইচ্ছেটা কি, সেইটে।

একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম কিন্তু কৌতূহলই জয়ী হলো। বললাম, সুস্মিতা কি বলে?

—ও, নো, সি কাণ্ট সে নো টু মি।

এত কন্‌ফিডেণ্ট শরদিন্দু? মনের মধ্যে জ্বালা করতে লাগলো। তবু হেসেই বললাম—তবে আর কি? আপনি বলছেন, ও সুপার্ব, সুস্মিতাও যখন কাণ্ট সে নো, বাধাটা কোথায় তবে?

—বাধা? নো। নো বাধা। হোয়েন মজুমদার সেজ ইয়েস, ইট ইজ ইয়েস। জানো, বিলেতে আমার বন্ধু মহলে এটা প্রবাদ হয়ে আছে। বাই দি বাই, ডু ইউ নো অশোক রয়?

বিরক্তি লেগেছিল। এত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলায় লোকটা। বুঝেছিলাম আমাদের অশোকের কথাই বলছে। তবু জিজ্ঞেস করলাম, কে অশোক রায়?

—জাষ্ট এ বয়। এ্যাণ্ড এ ক্রিকেটিয়ার টু-উ। দ্যাট্‌স্ হোয়াট সুনু টোল্ড মি। সুস্মিতাও বলেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। একটু খোঁজ খবর নিতে। দ্যাট বয় ইজ ইন লভ উইথ সুনু।

মিসেস সেনের মৃত্যুর পর সুস্মিতাই ন্যায়সঙ্গত গার্জেন হয়েছে, ছোট বোনের মঙ্গল-অমঙ্গল দেখবার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। তবু আমার খারাপ লেগেছিল শরদিন্দুর মাতব্বরীতে।

কি জানি, হয়ত হিংসা থেকেই এর উৎপত্তি। সামলাতে পারি নি নিজেকে। শরদিন্দুকে আঘাত করার অদম্য ইচ্ছার কাছে পরাভূত হয়েছিলাম সেদিন।

বললাম, অশোকের সঙ্গে আপনার দেখা না করাই ভাল।

—কেন? কেন? হোয়াটস্ রঙ।

—অঞ্জলি-ঘটিত আপনার ব্যাপারটা ওদের কাছে অজানা নয় তো, তাই রিসেপশন্‌টা তেমন করডিয়াল নাও হতে পারে।

এইটুকুতেই কাজ হলো। আর একটিও কথা বলে নি শরদিন্দু। আস্তে আস্তে নেমে গেল ছাদ থেকে। ও বোধহয় জানতো না যে ব্যাপারটা আমিও এতই জানি। জেনেও যে চেপেছিলাম তাইতেই লজ্জা পেলে আরো বেশী। পরদিনই চলে গেল কলকাতায়। হয়ত ভাবল, এ লোকও তো তেমন সুবিধার নয়। সব জেনেশুনেও ভেজা বেড়ালটি সেজে বসে আছে।

হাতে কোন কাজ ছিল না। তাছাড়া মনে অনেক জ্বালা। বিশেষ করে সুস্মিতার সঙ্গে দেখা করার জন্যই ছটফট করছিল মনটা। জ্বলতে জ্বলতেই একদিন আমিও কলকাতায় এসে হাজির হলাম। এর আরও একটা কারণও ছিল। অশোক একদিন বলল যে সুনীতা লিখেছে, ওদের এক আত্মীয় নাকি ওর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে কি সব লিখেছে। আর সুস্মিতা তাইতে বিগড়ে গেছে। সুস্মিতা যদি বিগড়ে গিয়েই থাকে সে দায়িত্ব আমারই। কারণ শরদিন্দুকে ওকথা বলার পর, যে অশোক তার একটা কেচ্ছার কথা সম্পূর্ণ জানে, তাকে সুনীতার বর হিসেবে কখনই রিকম্যাণ্ড করবে না ও। তাই অশোক সম্পর্কে যাহোক একটা কিছু বলে ব্যাগড়া দেওয়াই সম্ভব। অশোকের ক্ষতি যদি আমি করে থাকি, সেটা রিপেয়ার করার দায়িত্বও আমারই তো।

কিন্তু অশোককে সে কথা বললাম না। বললাম তুই ভাবিস না। আমি যাচ্ছি শীগ্‌গীরই কলকাতায়। শরদিন্দুর নামটা একেবারে চেপে গেলাম। কিন্তু এটা উদ্দেশ্য নয়। বলা যায় এটাও অজুহাত। সুস্মিতার সঙ্গে দেখা করার লোভটাই প্রধান হয়েছিল। বিশেষ করে শরদিন্দুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে সেটা আরও বেড়েছিল। কলকাতা গেলাম নিজের তাগিদেই। অশোকের অজুহাতে ভর করে।

এলাম কলকাতায়। আর সব ভুলেছিলাম। তখনকার মত একটা চিন্তাই সমস্ত মন জুড়েছিল, এই কলকাতা। এখানে সুস্মিতা আছে। ওরই জন্য এসেছি তো। সুস্মিতা—। যে সুস্মিতা একদিন আমার

হতে চেয়েছিল। যে সুস্মিতা একদিন আমারই ছিল। আজ?—কি জানি সুস্মিতা আজও আমার আছে কিনা? 'সি কাণ্ট সে নো টু মি'—শরদিন্দু বলেছিল, সেইটাই জানতে হবে তো।

একটা হোটেলে উঠলাম। সেদিনই সন্ধ্যায় গেলাম সুস্মিতাদের বাড়ি। কলিং বেল টিপতে বেরিয়ে এলো জনার্দন—পুরোপুরি জনার্দন বেয়ারা। বললে—আপনি?

ড্রয়িং রুমে বসেছিল ওরা। সুজু লাফিয়ে উঠল, উঃ কি মজা, কি মজা। সুনীতা হৈহৈ করল না আগের মত। করবে না জানতাম, সুনীতাও ভালবেসেছে যে। এ বেদনার ছেঁায়াচ একবার যার মনে লেগেছে সে কি আর প্রগলভ হতে পারে?

তবু মিষ্টি হেসে ওর পাশে জায়গা করে দিল সুনীতা। বললে, লগেজ কোথায়?—বললাম, একটা হোটেলে উঠেছি।—রাগের ভান করে সুনীতা বলল, বেশ!

আরো একটি মেয়ে ছিল। চিনি না। সুস্মিতা ওর সঙ্গেই কথা বলছিল। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলো, ভালো আছি কিনা।

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালাম। ও আবার সেই মেয়েটির সঙ্গে কি কথা বলতে লাগলো। তারপর এক সময়ে সেই মেয়েটি বললো—তবে তুই বেরুচ্ছিস না আজ আর?

—না, আয় তোদের আলাপ করিয়ে দি।—দুজনেই কাছে এলো।

—এ অমল রায়, আর এ রীনা মজুমদার।

বুঝেছিলাম, শরদিন্দুর বোন। চেহারাতেই অনেকটা আদল ছিল। বলল—শুনেছি আপনার কথা। আর আপনার বাড়ি থেকেও এসেছি কদিন। নিঃশব্দে হাসলাম। চলে গেল রীনা। আর সুস্মিতা এসে আমার সোফার হাতলটা ধরে দাঁড়াল। বললে—কোথায় উঠেছো?

সে কথার উত্তর জোগায় নি আমার মুখে। আমি তাকিয়ে ছিলাম সুস্মিতার মুখের দিকেই। কিন্তু কোথায় সুস্মিতা? সুস্মিতা সরে গেছে, অনেক দূরে সরে গেছে—ফিরে গেছে নিজের 'কোটে'।

বাঘ-বন্দী খেলা জানেন ? একবার নিজের কোটে ফিরে গেলে সেখান থেকে আর ফেরা যায় না। সেখান থেকে আর ফেরানোও যায় না। সুস্মিতা নিজের কোটে ফিরে গেছে। উগ্র সেন্টের গন্ধে, লিপ্‌স্টিক, নেলপালিস্‌, আর পাউডারের ঘন-প্রলেপের আড়ালে আমার সুস্মিতা ঢাকা পড়ে গেছে। অবাক হয়ে তাই দেখছিলাম। মুখে কথা জোগায় নি। অপ্রস্তুত হয়েছিল সুস্মিতাও। বলল—কিছু বলছ না যে ?

আজ আর লুকোলাম না। বললাম—বলবো বলেই তো এসেছিলাম।—বলেই আর দেরি করলাম না। যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

সুনীতা সুজাতা চেঁচামেচি শুরু করল—কোথা যাচ্ছেন ?

—সে হয় না—

—আজ ডিনার করতেই হবে এখানে—

—চা বলেছি বসুন—

—বারবার তো চা খান আপনি—

—কোথায় যাবেন এক্ষুণি—

—চা বলেছ ? গুড ! বসে পড়লাম আবার, বললাম—কিন্তু জল্‌দি।—বসার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না কিন্তু মনে হলো, চা না খেয়ে যাওয়াটা খুবই অশোভন হবে।

—সুজু, সুনু, তোমরা একটু ওপরে যাও তো।—বলল সুস্মিতা।

চলে গেল ওরা দুবোন।—পালাবেন না যেন অমলদা—এই ওয়ার্নিং দিয়ে।

—তাড়া কিসের ?—সুস্মিতা আমার দিকে না তাকিয়েই বলল। চাইতে পারছিল না আর আমার দিকে সুস্মিতা। আবার বলল —তাড়া আছে কোনো ? এসেই চলে যেতে চাইছ।

এমনি সময়ে চা নিয়ে ঢুকলো জনার্দন। সুস্মিতা চা ঢালতে লাগলো। একটা কাজ পেয়ে বর্তে গেল ও।

জনার্দন জিজ্ঞেস করল—কদিন আছেন কলকাতায় ?

—আজই চলে যাবো, তোমাদের কলকাতা ছেড়ে।

চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে সুস্মিতা বলল, আজ নাই বা গেলে।

ওর কথার জবাব না দিয়ে বললাম, আমার একটা কথা রাখবে?

—রাখবো—সঙ্গে সঙ্গে বলল সুস্মিতা।

বললাম—অশোক ভালো ছেলে। সুনীতাকে ও ভালোবাসে। যার কাছে যাই শুনে থাকো, আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

টিপাইটার পাশে আমার পায়ের কাছে কার্পেটে বসে পড়ে সুস্মিতা বলল– রাখবো এ কথা, আর?

—আর কিছু না।

আরও কি শুনতে চেয়েছিল সুস্মিতা? একটু থেমে বলল—আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা?

—আজ তুমি বড় টায়ার্ড, আজ নাই বা গেলে।

না-হেসে বললাম—ক্লান্তি—কত নদ-নদী, কত তেপান্তর পেরিয়ে এলাম যে, ক্লান্ত হবো না—

—তবে ফিরে যাচ্ছো কেন?—প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল সুস্মিতা।

—শিয়রের সোনার কাঠি হারিয়ে গেছে। আমার রাজকন্যা আর জাগবে না। রাক্ষসেরা আসার আগেই ভালোয় ভালোয় পালিয়ে যাই।

সুস্মিতা উত্তর করতে পারে নি। অব্যক্ত ব্যথায় স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক চেয়েছিল শুধু। দুজনের কারো কথা নেই। তারপর এক সময়ে আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে সুস্মিতা বলল—তোমার কাছে তো আর নেইই-জানি, কিন্তু সুনু বড় হয়েছে ওর কাছেও আমার কোনো মর্যাদা-বোধ থাকতে নেই?

—কি আমায় করতে বলো?

ম্লান হেসে সুস্মিতা বলল—আমি আর কিছুই বলি না। যদি মনে

কর আছে, কি করতে হবে তুমিই জানো তো। আবার মনে পড়ল। বললাম—অশোকের কথাটা ভুলে যেও না। সুস্মিতা বলল—না। তুমি বলেছো তাইতো যথেষ্ট। ভুলব না।

জনার্দনকে ওদের নিচে ডেকে দিতে বললাম। সুজু, সুনুকে। কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করলাম বসে ওদের সঙ্গে।

এক সময়ে সুনীতাকে ডাকলাম কাছে আসতে। বসালাম আমার পাশে, আর সুজুর কান বাঁচিয়ে বললাম—তোমার কেসটা এ্যাড্-ভোকেট করে গেলাম। ফিটা আপাততঃ পাওনা রইল।

—কেসে জিতবেন তো? ওপক্ষে কিন্তু ব্যারিস্টব।

—উকিল কি মক্কেলকে একথা বলে যে কেস্ খারাপ, বলে জেতার চান্সই নাইন্‌টি পার্সেন্ট।

—আর যে কেসে উকিল নিজেই মক্কেল, সে কেসের চান্স কত পার্সেন্ট?

অত্যন্ত আকস্মিক। অভাবনীয়ও। চুপ করে রইলাম। গম্ভীরও হয়ে গেলাম। সুনীতার কাছে এমন আশা করি নি তো? সুনীতা বসেছিল আমার পাশেই। হঠাৎ বলে ফেলে তারপর আমার কোলে মুখ লুকাল—আমি ভেবে বলি নি, অমলদা, আর বলবো না।

এই সুনীতা। মেঘটা কেটে গেল মনে। ওর পিঠে হাতটা বুলোতে বুলোতে বললাম—না বলো না! যারা হেরে যায় তাদের অমন করে বলতে নেই।—সুস্মিতাকে শুনিয়েই—শোনাবার জন্যই বললাম কথাটা।

কিন্তু সুস্মিতা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। রইল দূর দূরেই। যতক্ষণ আমি ছিলাম, ও ছিল নিচেই। এগিয়ে দিল গেট অবধি সুজু সুনুর পাশে পাশে। তবু কত—কতদূরে।

—আজই যাবেন?

—না কাল যাবো, দু-একটা কাজ আছে, সেরেই যাই।

কাজ সত্যি ছিল।

প্রথমত সুভদ্রা, কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করা। সুভদ্রার কাছে হয়ত লাড়ুমামাদের খবর পাওয়া যাবে। কল্যাণীরও সাধনার কতদূর জানা যাবে। মণি যে জেলে, কল্যাণী কি তা জানে? দ্বিতীয়ত ভূপেনদা ঢাকা জেলে আছেন। তাঁর পরিবারের সবাই কলকাতায় এবং অত্যন্ত অর্থ কষ্টে আছেন তাঁরা। ওদের সঙ্গেও দেখা করতে হবে। কিছু টাকারও ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় কাজটা সেরেই ফেলি এই ভেবেই সুস্মিতাদের ওখান থেকে সোজা কালীঘাটে চলে গেলাম। ওদের ওখানেও বেশীক্ষণ ভালো লাগলো না। ঘুরে ফিরে সুস্মিতার কথাই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সুস্মিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল! এত সহজে? আমিও তো সহজেই চুকতে দিলাম। এবং এও বলা চলে একেবারে চুকিয়ে দেওয়ার ভূমিকায় আমিই নায়কের রোল নিয়েছিলাম। ভালো করলাম কি? যাক যা হবার তো হয়েছে। তবে আর অত ভাবনা কিসের? হোটেলে ফিরে এলাম। ভাল ঘুম হলো না রাত্রিতে। সকালবেলা উঠলাম বেশ বেলায়।

বিছানা ছেড়ে উঠতে ভালো লাগছিল না তবু। বেলা বাড়তে লাগলো। শুয়েই রইলাম। একবার দিনের প্রোগ্রামটা ভেবে নিলাম। কল্যাণীর হোস্টেলে যাওয়া। কল্যাণী, সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করা। লাড়ুমামার খোঁজ পেলে তার ওখানে একবার যাবো। ব্যস্। রাতের গাড়িতে ঢাকা—।

তবে আর তাড়া কিসের? কাগজটা টেবিল থেকে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। একটু চোখ বুলিয়ে মোটা হরফের লেখাগুলো পড়েই আবার ছুঁড়ে ফেলে দিলাম কাগজটা। ভালো লাগছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। কেন এমন হলো। কেন হতে দিলাম। একটা অস্বস্তিকর অস্বস্তিতে ভরেছিল মনটা। কাল সন্ধ্যার কথা বারবার

মনে পড়ছিল। কেন নিজেকে অত খেলো করলাম। খেলোই তো। —তোমাকে পেলাম না বলে কষ্টে মরমর, কলকাতাটাই বিষ বিষ ঠেকছে—আকারে-প্রকারে এই তো বলেছি প্রায়। না বললেই পারতাম। ঢাকায় ওকে একদিন বলেছিলাম, আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে, নিজের পরিবেশে, নিজের সমাজের আওতায় আপনার লোকেদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমাকে আজকের মত এত দামী নাও মনে হতে পারে। তাই যে দাম আজকে দিতে চাইছ, অনেক বেশী দিয়ে ফেলার কষ্ট সেদিন রাখবে কোথায়? তাই আজ থাক, যদি সেদিনও দেবার ইচ্ছে থাকে তবে আমি তো আছিই। আমার সেই গণনা কেমন ঠিক ঠিক মিলে গেল, একথা বলে, বেশ একটা বিজ্ঞের মত ভান করে, কিছুই হয় নি আমার, এমন সহজ হয়ে ফিরে এলেই পারতাম। এতটুকু অভিনয়, তবেই তো খাসা হতো। কিন্তু একি করলাম? সুনীতাটাকে পর্যন্ত নিজের দুর্বলতার সাক্ষী রেখে এলাম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—। অস্বস্তিতেই উঠে বসলাম অবশেষে। এক কাপ চা বললাম। আর চা নিয়ে আসার অবসরে তৈরিও হয়ে নিলাম, চা খেয়েই বেরুব।

কল্যাণীর হোস্টেলে এসে দারোয়ানকে বললাম, সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ডেকে দাও তো।—কিন্তু যে ভদ্রমহিলা এলেন, তাকে আমি চিনি না। বললাম—কল্যাণী—

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই তিনি বললেন—আপনি ওঁর কোন আত্মীয় কি?

—হ্যাঁ।

—এক্ষুনি যাদবপুর হাসপাতালে চলে যান। ওঁর অবস্থা সিরিয়স্। কদিন থেকেই বারবার রক্ত-বমি করছে।

আর সুভদ্রার খোঁজ করা হলো না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তক্ষুনি ছুটলাম যাদবপুর।

কল্যাণীর সাধনার ফল ফলেছে তবে। যাদবপুরের দু-একটি ডাক্তারের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, খোঁজ নিতে দেরি হলো না।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিল কল্যাণী। সাদা দেওয়াল, ওর জীবনের মতই ধোঁয়াটে, ধোঁয়াটে ; সাদা, সাদা—কি দেখছিল কল্যাণী ? নিজের জীবনেরই প্রতিবিম্ব ?

—কল্যাণী—

চমকে চাইল কল্যাণী, এ পাশ ফিরে। তারপর আমায় দেখে মৃদু হাসলো—ও তুমি, তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। আমি নয়, আরও একজন এসে এমনি করেই 'কল্যাণী' ডেকে ওর পাশে দাঁড়াক, মনে মনে কল্যাণী কত না চাইছে।

খানিকক্ষণ ওখানে থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসেই প্রথমে কল্যাণীর বাবাকে তার করলাম একটা।

—কাম এ্যাট ওয়ানস্। কল্যাণী সিরিয়সলি ইল। লেটার ফলোজ —অমল।

আর সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে চিঠিও দিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কল্যাণীর খবর পেলেই আপনাকে জানাবো, একদিন এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজই খবর পেলাম। কল্যাণী টি বি হয়ে যাদবপুর হাসপাতালে আছে। আমি এইমাত্র ওখান থেকে এলাম। ওর মাকে নিয়ে পত্রপাঠ চলে আসবেন। দেরি করা উচিত হবে না। আজই তারও করেছি, আগেই পেয়ে থাকবেন।

নমস্কারান্তে, অমল।

যাদবপুরে ফিরে যেতে হবে আবার। কিছু ওষুধ পত্র নিয়ে। কিছু টাকারও দরকার। আমার কাছেও টাকা ফুরিয়ে এসেছিল। কল্যাণীকে পেয়িং ওয়ার্ডে বদলি করার কথা বলে এসেছি। এইসবে সব টাকাই তো যাবে। তারপর আমার উপায় কি ? কার কাছে পাবো টাকা ? তবু তা ভাবলেও তো চলে না। কল্যাণীকে বাঁচাতে হবে। কল্যাণীর বাবাও নিশ্চয়ই আসবেন, দেখা যাক। কলকাতা ছাড়া হলো না আর।

আবার একদিন গেলাম, সুভদ্রার খোঁজে। কিন্তু ওরা বলতে

পারলো না সুভদ্রার খবর। মাস কয়েক আগে ওখান থেকে চলে গেছে।

—আমাদের স্কুলেও নেই আর। টি. সি. নিয়েছে স্কুল থেকেও। কল্যাণী কেমন আছে?—জিজ্ঞেস করলেন সেই কল্যাণীর জায়গায় আসা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মেয়েটি।

বললাম—এই একরকম।—চলে এলাম ওখান থেকে। লাড়ুমামা, পুঁটিমাসী, সুভদ্রা—কোথায় গেল ওরা? কলকাতাতেই আছে কি? কে বলে দেবে?

কল্যাণীর বাবা-মা এসেছেন। উঠেছেন ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি। দেখা হলো হাসপাতালে।

কল্যাণীর অবস্থা আজকে আবার খারাপ হয়েছে। কাল একটু ভাল ছিল। কথা বলেছিল কাল।

বলেছিল, অমলদা, ওর সাথে দেখা হয়েছিল একদিন।

—কবে?

—অ-নে-ক-দিন আগে। কিন্তু কথা বলল না তো। ট্রামে যাচ্ছিল। আমায় দেখেই জানলার বাইরে মুখ করে রইল। কতবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু কিছুতেই, আমিও কিছুতেই বলতে পারলাম না। ডাকতে সাহস হলো না কেন? একটা স্টপে ও নেমে গেল ট্রাম থেকে। আমার দিকে আর একবারও চাইল না। একটু থেমে আবার কল্যাণী বলেছিল,—সেই থেকে বড্ড ভয় পেয়ে গেলাম। ও যদি এমনি করেই মুখ ঘুরিয়ে থাকে, আর আমি যদি কোনদিনই ডাকতে না পারি—সাহস না পাই?

এই চিন্তাটাই কল্যাণীকে ক্ষয় করে ফেলেছে।

টি. বি.—ক্ষয় রোগ। কে যে এই আশ্চর্য নাম দিয়েছিল। ক্ষয়ই বটে।

চোখের সামনে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে খরচ হয়ে গেল কল্যাণী। মায়ের চোখের জল, পিতার ব্যগ্রতা, কিছুতেই কল্যাণীকে ধরে রাখতে পারলো না। হাসপাতালেই একদিন ও মারা গেল।

সেই দিন। মারা যাওয়ার দিন, চুপিচুপি আমায় ডেকে বললে —অমলদা, সেই চিঠিটা আছে তোমার কাছে? ঐ যেটাতে লিখেছিল, নৈবেদ্য কিনিয়াছি, কিন্তু কেন কিনিলাম— ?

বিকার ?

কি উত্তর করবো ? আর সেই চিঠিটার কথা কি ছাই আমারই ভালো মনে ছিল ?

আরো একটু থেমে কল্যাণী বলেছিল, কিন্তু সেইদিন বড় কষ্ট হয়েছিল। ঐ যেদিন ট্রাম থেকে নেমে চলে গেল! একটি কথাও বলে নি। মনে হয়েছিল, ঘর ছেড়ে, বাবা-মা ছেড়ে, সব, স-অ-অ-ব ছেড়ে এই জন্যেই এসেছি ? তবে কি পেলাম ? অমলদারে আমি মরে যাবো। সেই জন্য দুঃখ নেই, কিন্তু না পাওয়ার ব্যথা, কিছুই না পাওয়ার ব্যথা—সে কি ভোলবার ? দুচোখ বেয়ে ধারায় জল নেমেছিল। আর মরণের অনেক পরেও গালের ওপর চিক্‌চিক্ করছিল সেই অশ্রু।

আজও। চোখ বুজলেই আজও বোজা চোখের পাতায় স্পষ্ট ভেসে ওঠে কল্যাণীর মৃত মুখ। গালের ওপর অশ্রুর ফোঁটা তেমনি চিক্‌চিক্ করছে। তারপর কত, কত রাত বন্ধ্যা চিন্তায়, নিরুপায় উৎকণ্ঠায় অযথা খরচ হয়ে গেছে—শুধু ঐ কথাই ভেবে ভেবে। ভোরের দিকে শ্রান্তিতে যখন চিন্তাটা বোঝা হয়ে মস্তিষ্কে চেপেছে তখন ঘুম ঘুম তন্দ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখেছি—নিরুপায় দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছি আমি আর কল্যাণী জিজ্ঞেস করছে—সেই চিঠিটা—

ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

হোটেলে ফিরে ঠিক করলাম আর নয় কালই কলকাতা ছাড়বো। সকালে উঠেই বেয়ারাটাকে বললাম, আমার বিল তৈরি রাখতে বলো ম্যানেজারকে, আজই চলে যাবো! নিজেও তৈরি হয়ে নিলাম। টুকিটাকি কটা সওদা, রিজার্ভেসন—এগুলো সেরেই আসি।

এমন সময় বেয়ারা খবর দিল, এক মেম্ সাব আয়া।

কে ? কে হতে পারে ?—বললাম, নিয়ে এস।

সুস্মিতাকে আশা করি নি, তবু, যে এলো সে সুস্মিতাই।

জিজ্ঞেস করল, যাও নি এখনো ?—

—কই আর গেলাম।—

—আর একদিনও তো এলে না—

—প্রয়োজন আছে কিছু ?—একটু শ্লেষের সঙ্গেই বললাম।

আমার কথার জবাব দিল না সুস্মিতা। শ্লেষটাও গায়ে মাখলো না। বলল—পর পর চারদিন স্টেশনে গিয়েছিলাম, দেখা হলো না। তারপর মনে হলো কি জানি কোথায় গিয়েছ, হয়ত ঢাকায় যাও নি। কাল রীণা বলল, তোমায় দেখেছে এসপ্লানেডে—ফ্র্যাঙ্করস থেকে বেরুতে। এই হোটেলেও ফোন করেছিলাম একদিন. ওরা বললে ঐ নামে কেউ নেই এখানে। কাল স্ট্রাইক করলো, তুমি নিশ্চয়ই নাম পাল্টে আছো, তক্ষুনি ঠিক করেছিলাম আজ আসবো।

—কেন ? কি এমন দরকার ?—

—বেরুবে ?—

—হ্যাঁ—

—চলো।—

দুজনে বেরিয়ে এলাম। নিচে নেমে ও বলল, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বাপির অফিসের সময় হলো তো—তাই। একটা ট্যাক্সি নাও। বাপি বদলি হয়ে যাচ্ছে দিল্লীতে।

—কোথা যাবে এখন ?

—চল, যে কোন একটা চায়ের দোকানে। একটু বসি, কথা রয়েছে আমার।

দুজনে এসে বসলাম ফেরাজিনিতে। নির্জন ফেরাজিনি।

—কফি ?—

মাথা নেড়ে অস্বীকার করল সুস্মিতা।

—কোল্ড ড্রিঙ্ক কোন—

—ন্‌না···।

—একটা কিছু নাও। আইসক্রীম নাও একটা।—একদিনের কথা মনে পড়ল। যেদিন সুস্মিতা ছেলেমানুষ হতে লজ্জা পায় নি

আমার কাছে। ঢাকায় একদিন। সুস্মিতা বলেছিল—জানো মাঝে মাঝে কলেজ পালিয়ে চলে যাই ফেরাজিনি, চলে যাই বুফেতে। একটা এ্যাই বড় আইসক্রীম নিয়ে খেতে থাকি। মনে হয় সবটাই খেয়ে নেবো। খেতে খেতে যখন আর পারি না—এত্তো বড় তো, কি করে খাবো ? তখন খুব কষ্ট হতো কেন অত বড়টা নিলাম। খেতেও ইচ্ছে নেই, ফেলতেও না। কি অবস্থা তখন, তাই না ?

হেসে বলেছিলাম, আইসক্রীমে বুঝি তোমার খুব লোভ ?

—ভীষণ।—সুন্দর মুখভঙ্গিতে ভীষণতার অভিব্যক্তি দিয়েছিল সুস্মিতা।

বেয়ারাকে ডেকে বললাম—এক কফি—হট্, এক আইসক্রীম।

অর্ডার নিয়ে বেয়ারা চলে গেল।

সুস্মিতা মুখ নিচু করে বসেছিল চুপচাপ। আমিও চুপ। কিছুক্ষণ অমনি কাটল। পরে এক সময়ে বললাম—সুস্মিতা, তুমি কিছু বলতে চাও।

নিঃশব্দে টেবিলের কাচে নখের অদৃশ্য আঁচড় কাটতে লাগল সুস্মিতা।

কফি এলো। ঢেলে দিল সুস্মিতা। এক পেয়ালা শেষ করতে আবার কাপ পূর্তি করে দিল। তবু নীরব।

—কিছু বলবে কি ?

আমার চোখে চোখে একবার চাইল সুস্মিতা। পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে নিল। চামচ দিয়ে আইসক্রীমটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। একবার দুবার বা কাপ থেকে চামচে তুলে প্লেটে ফেলে দিল। তবু কোন কথা নেই।

আমি আবার কফি আনালাম। নিজের হাতেই ঢেলে নিলাম কফি। একবার। দুবার।

সুস্মিতা তবু নীরব।

এবারে বললাম, যদি কিছুই বলার নেই তবে কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করলে। আজই চলে যাবো আমি। কাজও বাকি

কিছু কিছু। সারতে তো হবে।—তবু আরও একটু সময় দিলাম। তারপর বিল চুকিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালাম।—চলো।

বেরিয়ে এলাম চৌরঙ্গীর মোড়ে। বললাম—চলো, তুলে দি তোমায়। আমার এ পাড়াতেই একটু কাজ আছে। কিসে যাবে? বাসে উঠবে? ট্রামে? ট্যাক্সি ধরবো?

সুস্মিতা নিরুত্তর।

পর পর কয়টা ট্যাক্সি চলে গেল। বাসের পর বাস যাচ্ছে। রাস্তা পেরোলেই ট্রাম লাইন। লাইন ধরে ট্রামেরা যাচ্ছে সারি সারি। আমরা দুজন তবু দাঁড়িয়ে।

অবশেষে বললাম—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে পা ব্যথা হয়ে গেল।

—মন বলে যাদের কিছু নেই তাদের তো পা-ই ব্যথা হবে।—

বলেই আর দাঁড়ায় নি সুস্মিতা। হাত উঁচিয়ে নিজেই একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করাল। উঠে চলে গেল। বলে গেল, যাদের মন বলে কিছু নেই তাদের নাকি পা-ই ব্যথা হয়।

সুস্মিতা চলে গেছে অনেকক্ষণ। আমি তবু দাঁড়িয়েই রইলাম।

কত কথা মনে ভিড় করে এলো। কত ব্যথা। বুক বেয়ে উঠে এক ডেলা ব্যথা এসে কণ্ঠায় আটকে গেল। আর নামেও না, ওঠেও না। ব্যথা। ব্যথা। ব্যথা।

নীলকণ্ঠ বেদনায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কত—কতক্ষণ।

কলকাতাতে প্রায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করেছি। তাইতেই সাহস বেড়ে গিয়েছিল। আগে ঠিক করেছিলাম ভাগ্যকুলে নেমে যাবো স্টিমার থেকে। তারপর নৌকা আর হাঁটাপথে ঢাকা পৌঁছুবো। ভাগ্যকুলে পৌঁছে মনে হলো অত কষ্ট করে কি হবে? পুলিশ তো তত তৎপর নয়। অথবা হয়ত আমাকে এ্যারেষ্ট করতেও চায় না আর—স্টিমারেই নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত চলে এলাম। আর ধরা পড়লাম স্টিমার-জেটিতেই।

—এই যে অমলবাবু— মুখ তুলে চেয়ে দেখি নিশীথ দারোগা। তারপর ডাইনে, বাঁয়ে পেছনে যেদিকে চাই পুলিশ আর পুলিশ। ধরা পড়ে গেলাম। নিয়ে গেল ডি. আই. বি. অফিসে। সেখান থেকে সোজা জেল গেট। অন্দরে নয়া বিশ ডিগ্রি।

পরিচিতরা ঠাট্টা করে বললেন—স্বাগতম, সুস্বাগতম। এত দেরি করলেন যে।

যেন বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নে দু ব্যাচ বসে যাওয়ার পর কর্মকর্তাদের প্রীতি-অনুযোগ। ধরা পড়ে আমারও কিছু খারাপ লাগছিল না। প্রসন্ন হাসিতে কুশল শুধালাম আমিও।

আস্তে আস্তে সবাইকার খবর নিলাম। ওরা বাইরের খবর জিজ্ঞেস করলেন—কাগজে যা পড়ি সব সত্যি?

—না।

—তবে?

—কাগজওয়ালারা সব খবর রাখে না। রাখলেও দেবার সাহস নেই তো। বন্ধ করে দেবে না কাগজ?

—আপনি বলছেন কাগজে যা বেরুচ্ছে অবস্থা তার চেয়েও খারাপ?

—আমি বলছি, কাগজে যা বেরুচ্ছে অবস্থার তুলনায় তাকে মোটেই খারাপ বলা চলে না। কাগজে যা বেরুচ্ছে, আমি বলছি, ততটুকু খবর পরিবেশন করতে সরকারেরও আপত্তি নেই। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে!

—তবে কি হবে?

হেসে বললাম—কি আর হবে? আমরা তিন টাকা বারো আনার দিন-মজুরী পাবো। ব্রিটিশ-সিংহ, যাই বলুন, সদাশয় নো-ডাউট্।—একটু চিমটি কাটতে চেষ্টা করেছিলাম, তার একটা মজুরী নেই? স্পষ্ট দিয়ে দিল।—তিন টাকা বারো আনা রোজ। তার এক টাকা দু আনা যাবে স্কেল-ডায়েটে—বাকিটা দিয়ে এন্তার সিগারেট ফোঁক, চাই কি ফল-ফলাদি, ঘিউ, মাখ্খন—যা খুসী। আমাদের চিন্তা কি?

—আর ওরা ? বাইরের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ?

—যুদ্ধে যাবে। না যায়, না-খেয়ে মরবে, তাও যদি না পারে, আধমরা হয়ে ধুঁকবে। ওদের জন্য চিন্তা নেই।

—শ্যামাপ্রসাদবাবু রিলিফ ফাণ্ড করেছেন শুনছিলাম।

—হ্যাঁ, শ্যামাপ্রসাদবাবু 'বেঙ্গল রিলিফ ফাণ্ড' করেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ দিচ্ছেন। তারও পরে আছে সরকারী লঙ্গরখানা।

—সেটা কি জিনিস ?

—লঙ্গরখানা অর্থাৎ গ্রুয়েল কিচেন—অসিদ্ধ ডাল, পচা চাল, গুচ্ছের লবণ আর শুকনো আলুর অনিন্দ্য সমন্বয়—লঙ্গরখানার খিচুড়ী।

—লোকেরা খেতে পারে ?

—পারে। ক্ষুধায় মরবার আগে মানুষ তাও খায়। তবে খেয়ে অবিশ্যি আর বাঁচে না। আধ-পেটা আধ-পেটা বরাদ্দের এক হাতা ঐ অখাদ্য খাওয়ার পরে অসুখে পড়ে। সেই যে পড়ে আর ওঠে না। অবশ্য তখন তো আর ক্ষুধায় মরে না কেউ। ক্ষুধায় মৃত্যুর রেকর্ড নেই। দুর্ভিক্ষ হয় নি এদেশে। খাওয়া জোটে না ? চলে এসো লঙ্গরখানায়। তিনদিন পর পর বরাদ্দ এক হাতা খিচুড়ী—অবশ্য প্রমাণ সাইজের হাতা।

—তিনদিন পর পর কেন ? লঙ্গরখানায় রোজকার বন্দোবস্ত নেই বুঝি ?

—তা আছে। তবে বাই রোটেশন তোমার চান্স এলে তো ? তিনদিনও হতে পারে চারদিনও হতে পারে, চান্স আসুক—তবে তো ?

—এমন অবস্থা ?

—তবে আর বলছি কি ?

—এবারে তবে বেরিয়ে দেখবো, দুর্ভিক্ষে সব সাফ ?

—দুর্ভিক্ষ ? দুর্ভিক্ষ তো হয় নি। এ বিষয়ে সরকার বড় পরিষ্কার। হয় যুদ্ধে এস, পাবে ভাল মাইনে, পাবে রেশনড ফুড কমোডিটিস্, অথবা লঙ্গরখানায় যাও—পাবে সেখানেও। খিচুড়ী

মজুত। বেছে নাও যে কোন একটা, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয়েছে, একথা বলতে পারবে না। ফেমিন ?—উঁহু দুর্ভিক্ষ নেই !

—আর রামকৃষ্ণ মিশন, বেঙ্গল রিলিফ— ?

—মানুষের চাহিদা পর্বত প্রমাণ, ওঁরা কতটুকু দেবেন ? তবু বলবো ত্রুটি নেই। রামকৃষ্ণ মিশন যা করছেন তার তুলনা নেই। একজনের সঙ্গে আলাপ হলো, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অদ্ভুত মানুষ—কাজ করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা—এ দুয়ের অপূর্ব সমন্বয় দেখলাম লোকটির মধ্যে। শ্রদ্ধা হলো।

বেঙ্গল রিলিফও কাজ করছে। শ্যামাপ্রসাদবাবুকে চিঠি দিয়েছিলাম একটা, তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন, সমস্ত দেশকে খাইয়ে রাখার ক্ষমতা ওঁর যে নেই তা তিনিও জানেন। তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেই বা থাকেন কি করে ? আরও লিখেছিলেন, মোটামুটি যে সব রাজনৈতিক কর্মী, এই মুহূর্তে জেলে আছেন তাঁদের পরিবার-বর্গ, বা যে সব সমাজসেবী আজ এই দুর্দিনে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে অনেকেরই এমন কি দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন—সেই সব ক্ষেত্রে যথাসাধ্য করাটাই ওঁর আসল উদ্দেশ্য ? সাহায্য দরকার, এমন মনে করলে, সেই সব ঠিকানা ওঁকে জানাতে লিখেছিলেন।

অনেককে পাঠিয়েওছেন কিছু কিছু টাকা।

—আমাদের ঐদিককার খবর কি ?—সত্যেন বলে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল। ওর বাড়ি কলমা।

বললাম, হ্যাঁ, তোমাদের ঐদিকটাতেই সবচেয়ে ভাল হচ্ছে রিলিফের কাজ। কলমা, ভরাকর, বাসিরা; সাওগা, ঐ অঞ্চলটা। রামকৃষ্ণ মিশনের একটা সেণ্টার হয়েছে কলমায়—আরও একটা সেণ্টার হয়েছে আউটসাহীতে। কাইচাইল, পূরাপারা, সোনারঙ নেত্রাবতী এসব দিকে কাজ হচ্ছে সেখান থেকে। তবু এই দুটো অঞ্চল এরই মধ্যে মোটামুটি ভাল।

—কম্যুনিস্টরা, ওরা কি করছে ?

—ওরা জনযুদ্ধ করছে।

—শালারা।—একই সঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল।

আমি বললাম—না ওটা ঠিক গালাগাল দেবার মত ব্যাপার নয়। আপনারা জেলে—আমি বাইরে ছিলাম বলেই, অবস্থা চাক্ষুষ করেছি বলেই, এটা বলছি। ওদের যা স্লোগান— স্ন্যাচ্ দা ইনিসিয়েটিভ অফ দা ওয়র ফ্রম দা হ্যাণ্ডস্ অফ দা ব্রিটিশ ইমপিরিয়েলিস্টস্ —এটা এককথায় নস্যাৎ করে দেবার মত নয়। যথেষ্ট তর্কের অপেক্ষা রাখে। মত আর পথের পার্থক্যে শ্রদ্ধা হারানো কোন কাজের কথা নয়। আমার তো তাই মনে হয়। তবে কি জানেন? স্লোগান কি ভাবে ইমপ্লিমেণ্টেড হতে যাচ্ছে সেটাও দেখতে হবে বৈকি!

যখন দেখেছি, কম্যুনিস্ট কর্মী লঙ্গরখানায় টহল দিয়া বেড়াচ্ছে। তদ্বির তদারক করছে ঐ অখাদ্য জনসাধারণের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থার, তখন শ্রদ্ধা হারিয়েছি।

অবশ্য এই লঙ্গরখানার ওপর স্পেসিফিক্যালি কম্যুনিস্ট পার্টির হয়ত কোন ডিসিশন নেই। হয়ত এটা আদপেই একটা লোক্যাল ব্যাপার—কিন্তু যে কয় জায়গায় দেখলাম, ওদের কর্মীরা তো এই করে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধার তাড়নায় যে সব মানুষ পাগলা হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে একটা চিপ পপুলারিটি কুড়োনোর কদিচ্ছা যেন। তবে আপনাদের কথা তো তা নয়? আপনাদের এ একটা রোগ। যাকে খারাপ বলতে হবে তাকে যে করেই হোক—সেই জল-ঘোলা-করা ভেড়ার গল্পের মত।

—তবে আমরাই ভালো আছি—?

—তোফা—তোফা—। নিশ্চিন্ত। নিরুদ্বেগ। খাও, ঘুমাও—ঘুমাও, খাও। আর কি?

—কিন্তু সে তো হয় না আমাদেরও ভাবতে হবে। আমরা জেল অথরিটির কাছে পারমিশন চাইব। আমাদের দৈনিক বরাদ্দ থেকে বাঁচিয়ে আমরা বুভুক্ষু জনতাকে তার অংশ দেব। আমাদের

এই জামা-কাপড় পোশাক-আশাকের ছড়াছড়ি—এত তো নিষ্প্রয়োজন। এই থেকে আমরা কিছু কিছু বাইরে পাঠাবো।

সেদিন একটা মিটিং করেছিলাম আমরা। এই ডিসিশন হয়েছে।

—সঙ্কল্প মহৎ। কিন্তু—হায় প্রয়োজন যেখানে গোটা সমুদ্রের, এক কেটলী জলে কি হবে? জেলারের চাকর, সাব-জেলারের মালী অথবা রামদীন জমাদারের কিঞ্চিৎ সংস্থান অবশ্য হবে—আমার আপনার তাতে লাভ? অবশ্যি এ যদি নিজেদেরই মনের প্রসারতা রক্ষার ট্রায়াল হয় তবে আমার কিছুই বলবার নেই। আমরাও বাইরে থেকে আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার কিছু কিছু শুনতে পাই তো। আপনারা নাকি এ ওর কাপড়-কাচা-সাবান চুরি করছেন। মাছের টুকরো ছোট হল বলে প্রায় হাতাহাতি করেছেন—এমন কত?—জিজ্ঞেস করলাম—সত্যি?

সত্যেন উত্তর করল, প্রায়-সত্যের কাছ ঘেঁসে। জানেন—এই চার দেওয়ালের সংকীর্ণতা আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে। মনে মনে আমরা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমশঃ। আমার তাই মনে হচ্ছে দিনের পর দিন।

এই ছেলেটি নতুন, আমারই রিক্রুট। ছেলেটি ভাবে—চিন্তা করে, এইজন্যই ওকেও আমার বড় ভালো লাগে। বড় গরীব ঘরের ছেলে।

এক সময়ে ওকে কাছে ডেকে বললাম, সত্যেন ভেবো না। তোমার বাড়িতে আপাততঃ আমি বন্দোবস্ত করে এসেছি। তোমাদের ওখানকার রিলিফের সেক্রেটারীকেও বিশেষ করে বলে এসেছি, তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

আমি আস্তে আস্তে সবার অলক্ষ্যে বলেছিলাম কথাটা। আস্তে আস্তে সবার অলক্ষ্যেই সত্যেনও উত্তর করল। বলল—অমলদা সেইজন্য ভাবি নি তো। কত লোক না খেয়ে যদি মরে আমার বিধবা মা, আমার ছোট ছোট ভাইবোন ওরাও মরুক। সে তো আমার লজ্জার নয়। ওদের জন্যই বিশেষ করে আমি

ভাবি নি, ভাবছি না। আমার ভাবনা সবার জন্যই। তা ছাড়া আমারও এ কথা মনে হয়েছে যে আপনি যদি এ অঞ্চলে থেকে থাকেন তবে কোন না কোন, বন্দোবস্ত একটা করেইছেন।—বলে হাসলো।

ওকে এতকাল স্নেহ করে এসেছি। এই মুহূর্তে মনে হলো আজ থেকে শ্রদ্ধাও করতে হবে তো।

সুস্মিতাকে একদিন বলেছিলাম, শ্রদ্ধা কেউ কাউকে এমনি করে না। শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়।

বিশটা সেল, আর নূতন তৈরি অতএব নয়া বিশ ডিগ্রি, কিন্তু পাগলা ফাটক! এককালে হয়ত পাগলদের রাখা হয়েছিল এই ওয়ার্ডে অথবা হয়ত কেউ পাগল হয়ে গিয়েছিল, এই ওয়ার্ডে থাকতে থাকতে। দুদিন বাদেই কনফার্মড্ হয়ে চলে এলাম পাগলা ফাটকে।

প্রথমেই দেখা শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে। সেই শ্রীকণ্ঠবাবু যিনি একদা বাঙ্গালী জাতিকে বিষ্ঠা খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

করোনেশন পার্কে সভা হচ্ছে। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রাণপণ চীৎকারে বক্তৃতা করছেন ঃ

উকিলকে বলিলাম—উকিল তোরা ওকালতি ছাড়িয়া দে। উকিল বলে, ওকালতি ছাড়িলে খাইব কি? মাস্টারকে বলিলাম, মাস্টার স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দে। মাস্টার বলে, স্কুল ছাড়িলে খাইব কি? সরকারী চাকুরিয়াকে বলিলাম, চাকুরে চাকুরী ছাড়িয়া দে, সরকারী চাকুরিয়া বলে, চাকুরী ছাড়িলে খাইব কি? মোক্তারকে বলিলাম, মোক্তারী ছাড়। সে বলে তবে খাইব কি? দুঃখিত হইয়া কহিলাম—বাঙ্গালী জাতি তুই 'গু' খা।

তার এই দুঃখিত-নির্দেশ আজও আমাদের হাসির খোরাক জোগায়। অথচ দেখেছি সাধারণের ওপর কি অদ্ভুত প্রভাব। আর তার উৎস এই ধরণের বক্তৃতার মধ্য দিয়েই।

শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে কথা বলছি আর তক্ষুণি জেল গেট থেকে ডাক এলো আবার। এলাম গেটে। গেট বলতে জেলারের অফিস। জেলার বললেন আমি যেন তৈরি থাকি, কাল সকালের ট্রেনে আমাকে কলকাতা যেতে হবে।

—কেন?

—জানি নে মশাই, পুলিশ-কর্তাদের ইচ্ছা। আমার কাজ সংবাদটা আপনাকে পৌঁছানো, পৌঁছে দিলাম।

তৈরি হলাম। তার পরদিনই সত্যি নিয়ে গেলো কলকাতায়। কলকাতায় এনেছিল ইনটারোগেশনের জন্য। লর্ড সিন্‌হা রোড। তারপর দিল্লী। দিল্লীতেও বেশীদিন থাকতে হয় নি। দিন সাতেক।

আর বড় আরামে ছিলাম সে কদিন। কেন তাই বলি। মাত্র যেয়ে পৌঁছেছি। একটু বাদেই সংবাদ এলো 'ভিজিটর'।

ভিজিটর? আমার? এই দিল্লীতে কে আছে এমন? তা ছাড়া এই অসময়ে ভিজিটর?

কুয়াসাটা কাটলো জেল গেটে এসে। মিঃ সেন!

আমিও অবাক হলাম। তিনি যে আসবেন, এমন কল্পনা করি নি। হেসে বললেন—হাউ আর ইউ, বয়?

আমিও নীরবে হাসলাম।

তিনি বললেন, কিছু দিন হলো দিল্লী বদলি হয়ে এসেছি। —কাল রাতে স্বজুর ট্রাঙ্ক-কল পেলাম, কলকাতার কাগজে বেরিয়েছে, তোমায় দিল্লী আনা হচ্ছে। আমি যেন দেখা করি তোমার সঙ্গে।—

সময় নেই তবু অফিস থেকে কয়েক মিনিটের জন্য এসেছেন। প্রচুর খাবার এনেছিলেন। মিষ্টি, ফল, বিস্কিটের টিন, জ্যাম, জেলি—কত কি! বললেন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করো। একটু সময় থেকেই চলে গেলেন তিনি। আর দেখলাম, মেট থেকে শুরু করে জেলার অবধি সবাই আমাকে খাতির করতে শুরু করেছে।

বুঝলাম, মিঃ সেনের পদমর্যাদা আমারও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আরও বুঝলাম, স্বজু ট্রাঙ্ক-কল করার প্রেরণাটা কোত্থেকে পেলো।

করার তো কিছু নেই। চৌরঙ্গী পাড়ার এক অভিজাত গৃহে একদিনকার একটা সম্ভাব্য ছবিকে মনে মনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঃ

কাগজটা হাতে নিয়ে সুজু ছুটে গেলো—এই দিদিভাই ছাখ কি কাণ্ড ?

—কি হয়েছে ?—ঘুমে জড়ানো চোখ ভাল করে না খুলেই জিজ্ঞেস করল সুস্মিতা। বিছানায় শুয়ে থেকেই।

—অমলদাকে এ্যারেস্ট করে দিল্লী নিয়ে যাচ্ছে।

সকাল বেলাকার আমেজের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। উঠল সুস্মিতা। উঠে বসে কাগজটা সুজুর হাত থেকে টেনে নিল। সংক্ষিপ্ত সংবাদ। কে এক অমল রায়কে ঢাকায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কাগজে সংক্ষিপ্ত সংবাদটা পড়বে সুস্মিতা। একবার পড়বে। আবার গোড়া থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। তারপর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবে সারা বাড়ি—প্রতিকার-হীন অস্বস্তিতে।

অশান্তিটা ওর মনে সন্ধ্যে পর্যন্তও থাকবে।

বার বার ওপর-নিচ করবে। একটা বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করবে। পারবে না। জনার্দনকে মিছামিছি গাল দেবে। আর সুজু ততক্ষণে ভুলে গেছে ব্যাপারটা। ও মনে করিয়ে দেবে।

—সুজু তুমি একটি গবেট।

—কেন ? কেন ? কি করলাম আমি ?

—তোমার বন্ধু জেলে আর তুমি বেশ মজা করে বেড়াচ্ছো।

—বা রে, মজা আবার কোথায় ? তা ছাড়া আমি কিই বা করতে পারি ?

—কেন, বাপিকে ফোন করে দাও না ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

—কি মজা, তাহলে বেশ হয়।

যতক্ষণ ফোনে কথা হবে, সুস্মিতা ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রতিটি উত্তর

বুঝতে চেষ্টা করবে সুজুর মুখের দিকে তাকিয়ে। সুজু ফোন ছেড়ে দিতেই ওকে জিজ্ঞেস করবে আলাপের বিস্তৃত ফলাফল।

ভাবতে ভালো লাগে। হয় তো ঘটে নি। হয় তো সুজু নিজে থেকেই ফোন করেছে। তবু এই ভাবতেই ভালো লাগে। আর কারো তো কোন ক্ষতি নেই তাতে। কি ভাবছি কেউ জানবেও না কোনদিন। তবে আপত্তি কি ?

রাজার হালে ছিলাম দিল্লীর কয়েকটা দিন। ভাবনাটাও রাজোচিত হওয়া চাই তো! কিন্তু কদিনই বা। ফের নিয়ে এলো কলকাতায়—প্রেসিডেন্সীতে।

মণির সঙ্গে দেখা হলো যেন কত—কত যুগ পরে। তবু কত ভয়ে ভয়েই না ছিলাম। ভয় ছিল কল্যাণীর কথা কি বলব—কেমন করে বলব ? সেটাই।

মণি কিন্তু তার ধার কাছ দিয়েও গেল না। এ কথা, সে কথা, রাজনীতির খবর, কে কোন জেলে আছে, কারা বা এখনো বাইরে—রাজনীতির বন্ধুদের খবর। সঞ্জীব, সমীর, চিত্ত, অশোক, লাড়ুমামা—শুধু কল্যাণীর কথাই জিজ্ঞেস করল না। ওর কথাই বাদ দিল। সন্দেহ হলো, জানে নাকি সব খবরই ?

কল্যাণী মৃত্যুর আগে একটা চিঠি দিয়েছিল, মণিকে দেবার জন্য। বলেছিল, অমলদা রে, যার জন্য জীবনে সবদিক দিয়ে নিরাশ হয়েছি, তার জন্য অনেক আশার কথা লিখে গেলাম, এই চিঠিটা ওকে পোঁছে দিস্।

অনেক যত্নে রেখেছিলাম সে চিঠি। কতবার পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কত-না সন্তর্পণে রাখতে হয়েছে। যতবার জামা পাল্টিয়েছি, ততবারই পুরনো জামার পকেট থেকে নতুন পরা জামার পকেটে ঢুকিয়েছি। কতবার মনে হয়েছে মণিরই চিঠি তো, পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দি। মণিকে বুঝিয়ে বললেই হবে পরে। তবু কি এক মায়ায় পারি নি। কল্যাণীর মৃত্যুর ছবিটা চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠেছে। গালের ওপর শুকিয়ে যাওয়া সেই অশ্রুর ঝিকিমিকি

তারপর একদিন পালে বাঘ পড়ল। যেন হঠাৎই মনে পড়েছে। যেন এতদিনের মধ্যে এই প্রথম মনে পড়ল এমনি করেই প্রশ্নটা শুরু করেছিল মণি।

—আচ্ছা, ঐ কল্যাণীর খবর কিছু জানিস?

আমি চুপ করে রইলাম। মণিই আবার বলল—ওর সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল ট্রামে। অনেকদিন আগে।

—জানি।

—কে বলল—কল্যাণী?

—হ্যাঁ।

—কোথায় আছে ও?

আমি আবার নিরুত্তর। হাতের দৈনিক কাগজটায় অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠলাম।

—কোথায় আছে, কি করছে?

এবারেও চুপ করে রইলাম আমি।

—তোর সঙ্গে দেখা হতো কলকাতায়?

—মাঝে মাঝে।

—ও কোথায় আছে?

কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে চাইলাম মণির মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলাম, কল্যাণী নেই।

অনেকক্ষণ কারো মুখে আর কথা জোগাল না। তারপর এক সময়ে মণি আবার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল?

—ক্ষয় রোগ।

ক্ষয় রোগই তো। ক্ষয়ে ক্ষয়ে মানুষ খরচ হয়ে যায় যে রোগে, সেতো টি. বি. নয়, যক্ষ্মাও নয়, তার নাম ক্ষয় রোগই।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার মণি জিজ্ঞাসা করল, আর আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

—ঐ লোকটি রায়টে মারা গেছে জানিস?

—কোন লোকটি?

—ঐ যে সুর করে বাচ্চাদের বই ফেরি করতো।

মনে পড়ল আমারও। সেই মজাদার ফেরিওয়ালাটি। কিন্তু তার সঙ্গে কি সম্পর্ক? অবাক হয়ে শুনলাম মণি সুর করে বলে যাচ্ছে—সেই ফেরিওয়ালাটির মত সুর করে—ককা লো, কুকি লো মায়রে গিয়া কাইন্দা কাইন্দা ক—উঁহুঃ উঁহুঃ উঁহুঃ, মা দুইখান্ পয়সা দ্যাও। মায় কইব কি করবি? তখন আবার কাইন্দা দিবি, উ হুঃ, উঁহুঃ, উঁহুঃ, কাইন্দা কাইন্দা কবি অ আ পরুম, স্বরে অ, স্বরে আ, রইস্য ই, দীর্ঘ ঈ, ক খ পরুম্ ক, খ, গ—

অবাক হয়ে দেখছিলাম। সেই দুঃখেই মণির চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে?

তাই তখন আর কিছু বললাম না। সন্ধ্যার পরে মণি যখন একা একা শুয়েছিল ওর ঘরে, তখনই ধরলাম ওকে।

একটা চেয়ার টেনে বসলাম আমি। মণিও উঠে বসল। একটা দুটা এই-তা বলে তারপর একসময়ে বললাম—এ চিঠিটা কল্যাণী দিয়েছিল। ওর মৃত্যুর দিন। তোকে দেবার জন্য। থেমে থেমে আস্তে আস্তে বললাম আর এগিয়ে দিলাম অনেক যত্নে রক্ষিত পকেটে পকেটে বদল হতে হতে জীর্ণ মলিন এনভেলাপটা।

সেটা হাতে করে মণি চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা সেই এনভেলাপের এক কোণে ধরিয়ে দিল। অবাক হয়ে দেখলাম। একঘর পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে কল্যাণীর অপঠিত চিঠিটা নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তবু কিছুই বলতে পারি নি। মণির কপালের ওপর সেই শিরাটা আজ আবার বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বন্ধ লোহার গরাদের ওপর পা দিয়ে চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। রাত দেড়টা দুটো হবে। ঘুম আসছিল না। বারান্দায় টক্‌টক্-টক্-টকাস্ পাহারার পুলিশ টহল দিচ্ছে। বসে বসে ভাবছিলাম—না কিছুই ভাবছিলাম না। যা যখন মনে আসছিল

তাই নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করছিলাম। কল্যাণী—মণি—অঞ্জলি—সঞ্জীব—জিতেনদা—কবে নাগাদ ছাড়া পাবো—সুস্মিতা—কোনটাই ভাবছি না আবার সবই ভাবছি।

একটা ভাবনা শেষ না হতেই তাকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে আর এক ভাবনার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কোন নিরুদ্দেশের পথে চলেছি। সে যদি আমায় নিরুদ্দেশের পথ না দেখাতে পারে তবে তলব করো অন্যতর ভাবনা। এমন সময় পাহারা-পুলিশ একটা ছোট্ট স্লিপ দিয়ে গেল হাতে।

—দশ নম্বর নে ভেজা।

দশ নম্বরে থাকে মণি। স্লিপটা খুলে পড়লাম ঃ

চিঠিটা পুড়িয়ে দিলাম। কারণ কল্যাণীকে আমি শ্রদ্ধা করি। জানি না ও কি লিখেছিল। ভয় হলো এতদিন যাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, মৃত্যুর পরে কি জানি যদি সে শ্রদ্ধা হারাই। তাই ওটা পুড়িয়েই ফেললাম।

একবছর কাটলো। সুখে দুঃখে। মাঝে মাঝে সঞ্জীবের চিঠি পাই। মাঝে মাঝে পত্র লেখে অশোক। সে সব পত্রের কিছু পড়া যায়, কিছুটা আর পড়া যায় না। আপত্তিকর বোধে পুলিশি-কর্তারা মোটা চায়না কালির তুলি বুলিয়ে দিয়েছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় দৈনিক পত্রিকা মারফৎ। তন্ন তন্ন করে পড়ি। মায় পাত্র-পাত্রী, শিক্ষক চাই, গুদাম ভাড়া—কিছুই বাদ দিই না।

কাগজেই একদিন সংবাদ বেরুল মিত্রপক্ষের জয় ঘোষণার। ভিক্টোরি অফ দা-এ্যালায়েড ফোর্সেস্। আমেরিকা, ব্রিটেন্, রাশ্যা। ভিক্টোরি সেলিব্রেশন্ হচ্ছে, এখানে, ওখানে, সেখানে।

মণিকে জিজ্ঞেস করলাম একদিন—এবারে তো ছাড়বে মনে হচ্ছে। বেরিয়ে কি করবি ?

—এম. এ. পরীক্ষাটা দেব।

—তারপর ?

—কোথাও কোন কলেজে একটা মাস্টারি নেব।

—এ্যাক্টিভ রাজনীতি ছেড়েই দিবি তবে? মজুর আন্দোলন? আসানসোল?

—ভেবে দেখলাম, আমাকে দিয়ে ওসব হবে না। শ্রমিক-সংগঠন করতে হলে, যে নিষ্ঠার দরকার, আমার মধ্যে তার অভাব অনেকখানি। আমি এতদিন যত বক্তৃতা করেছি, আমার মনে হচ্ছে তার অর্ধেক কথাই ওরা বুঝতে পারে নি। আমার ভাষা ওদের মনের তলায় পেঁছিতে পারে নি। ওদের মত করে বলবার আগ্রহ—কই ফিল্ করি নি তো। ওদের বোঝাতে হলে, ওদের ভাষায়, ওদের কথায়, ওদের বোধশক্তির নিচুতে নেমে যেতে হবে আগে। আমি টেম্পারামেণ্টালি আনফিট। একটু থেমে আবার বলল, লেখাপড়ার কাজ থাকলে কিছু কিছু করতে পারি।

চুপ করেই রইলাম। ওর সিদ্ধান্ত ও জানিয়েছে, আমার কিই বা বলবার থাকতে পারে? কিন্তু আমি? আমি কি করবো? এম. এ. পাশ, তারপর কোন কলেজে মাস্টারী? অসম্ভব। নিজের মনেই ভাবি অসম্ভব। আমি যে দেখেছি, আমি যে জেনেছি, ওদের পাশে পাশে থাকার প্রয়োজন কত বেশী। তাই—ভাবতে ভাবতেই একদিন ছাড়াও পেয়ে গেলাম। সেই চিন্তাটাই মনে ঘনতর হলো এবারে। কি করবো? কি করা যায়? গ্রামেই যাবো। শতকরা নব্বুইজন লোকে এদেশে গ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদেশে কিছু করতে হলে গ্রামগুলোকেই নাড়া দিতে হবে। কিন্তু একা আমিই বা কি করতে পারি? কারা কারা ছাড়া পেয়েছে? তাদের সঙ্গে একটা আলাপ-আলোচনা করলে হতো।

সুভদ্রার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। কলকাতার রাস্তায়।

—অমলদা—

এই কিছুদিনে কত বড় হয়ে গেছে সুভদ্রা। প্রথমে চিনতেই পারি নি। ও বললে, আমি সুভদ্রা, চিনতেও পারো না? তুমি কি?

—আচ্ছা। মা কোথায়?—হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

মা কাশীতে। আমি তো পাশ করেছি এবার। কলেজ খুলে গেছে, তাই চলে এলাম। হোস্টেলে থাকি। ডাণ্ডাস্এ।

একবার ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করি, লাড়ুমামা কোথায়? আবার কি ভেবে চুপ করে গেলাম। কি জানি লাড়ুমামার সঙ্গে ওর পরিচয়

—চলো না, নিউ মার্কেটে। আমার এক বন্ধু আসবে, চকোলেট খাবো তুজনে।—হাসিতে উচ্ছল সুভদ্রা।

ওর সঙ্গে চললাম নিউ মার্কেটের দিকেই। একসময়ে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম—লাড়ুমামা কোথায়?

—স্ স্ স্। লাড়ুমামাকে পুলিশে খুঁজছে। মামা নাকি একটা লোককে মেরে ফেলেছে। সত্যি? আমার কিন্তু বিশ্বাসই হয় না। মামা কি যে ভালো—মারতে পারে কখনো? পুলিশগুলো যেন কি!

এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সুভদ্রা, ফিস্‌ফিসিয়ে। আমি চুপ করেই ছিলাম। সুভদ্রা আবার বলল, মামা ঢাকার সব বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। কাশীতে বাড়ি কিনেছে একটা। মা থাকেন। আর মামা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। পালিয়ে পালিয়েই মাঝে মাঝে যান কাশীতে। আর আমাকে কি বলেছেন জানো? বলেছেন, তুই আমার মা। আমি যেখানেই থাকি তোর টাকার ভাবনা নেই। তুই পড়ে যা। কলেজে ভর্তি হ, কলকাতায় গিয়ে। মায়ের তো আর পড়াবার ইচ্ছেই ছিল না। খালি বলেন, বিয়ে দিয়ে দেব, বিয়ে দিয়ে দেব। মা-টা ভারী বোকা, না অমলদা? বিয়ে করে কি লাভ?

নিউ মার্কেটে এসে ওর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সুজাতা। সুভদ্রা বলল—জানিস, এ আমার দাদা।

উত্তরে সুজাতা বলল, কি কাণ্ডো, এ তো আমারও দাদা রে।—তারপর তুজনে সে কি হাসি!

ওদের চকোলেট কিনে দিলাম। ওরা খুব খুশী। আমার মনের মধ্যে কি ঝড় যে বইছিল, কত প্রশ্ন আকুলি বিকুলি করছিল ওরা কি করে জানবে? ওরা কতটুকুই বা বোঝে!

—সুনুদির বাড়ি যাবে ?—সুজাতা জিজ্ঞেস করলো।

অশোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সুনীতার, অশোকের পত্রেই জেনেছিলাম। ওরা থাকে ল্যান্সডাউনে। অশোকের বাসায় তো যাবোই, সুনুর সঙ্গেও দেখা হবে, কিন্তু আজ থাক। বললাম, আজ নয় সুজু, আর একদিন যাবো।—তবু সুস্মিতার কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

—অশোকদা 'বার্ড'এ খুব বড় অফিসার। অশোকদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তো সুনুদির। চলো না খুব মজা হবে। ওফ্ দিদিটা যদি থাকতো এখন কি মজাই না হতো। দিদি—বলতে বলতে থেমে গেল সুজাতা। অপ্রস্তুত হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমি আর ওকে বিব্রত করলাম না।

বললাম—না, তোমরা যাও আজ। আমার একটু কাজ আছে। ওদের এই বলেই এড়ালাম। একা—একটু একা থাকতে চাই। ঝড়ে নৌকো ভাসিয়েই ছিলাম, সুজাতা তায় পাল খাটিয়ে দিয়ে গেলো।

তারপর একদিন অশোকের সঙ্গেও দেখা করলাম। দেখা হলো সুনুর সঙ্গেও। অনেক কথা হলো। অনেক—অনেক। কিন্তু সন্তর্পণে ওরা এড়িয়ে গেল একজনের খবর। সুজাতা তবু বলতে গিয়ে থেমে গেছে, আর ওরা সেদিকের ধারে কাছেই ঘেঁষলো না—অশোকও নয়। না সেদিনও নিজে থেকে জিজ্ঞেস করি নি, জিজ্ঞেস করলে অশোক আমায় নিশ্চয়ই বলতো।

এরই মধ্যে একদিন দেখা হলো লাড়ুমামার সঙ্গে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছেন। চিৎকার করে আমায় ডাকলেন—জানতে চাইলেন, ভালো আছি কি না। কোথায় আছি। শীগ্‌গীর ঢাকা যাবো কি ?

আর তারপরেই ট্রামের রডটাকে জোরে চেপে ধরে লাড়ুমামা একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, সঞ্জীব বলে একটু জড়াইয়া গ্যাছে গা ?

কিছু বলার আগেই ট্রাম ছেড়ে দিল। দূরে, আরো দূরে লাড়ুমামা

ঝাপসা হয়ে গেলেন। অথচ কত কথাই না জানবার ছিল। সঞ্জীব কলকাতাতেই ছিল। অশোকের মুখেই ওর জড়িয়ে যাওয়ার কাহিনীও শুনেছিলাম। ছুদিন গিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে দেখা হয় নি, সঞ্জীবকে বাড়িতে পাওয়াই মুস্কিল। সময় দিয়ে একটা লোকাল পোষ্ট কার্ড ছাড়লাম একদিন।

সঞ্জীবকে বাড়ি থাকতে লিখেছিলাম। ছিলও। প্রথমেই সঞ্জীব বলল, শেষ পর্যন্ত শরদিন্দুকেই বিয়ে করল সুস্মিতা ?

—এই প্রথম শুনলাম।

—কেন, অশোকরা বলে নি ?

—না তো !

—কি যেন একটা ব্যাপার আছে। সামথিং ইজ রং। তা ছাড়া অশোক একটু পাল্টেছে। একটু যেন রিজার্ভড্। একটু থেমে আবার বলল, শরদিন্দু সুস্মিতারা যায় না তো অশোকের ওখানে কখনো। আমি তো প্রায়ই যাই—কোনদিন দেখি নি। এ তো আর জিজ্ঞেসও করা যায় না। বোধহয় শরদিন্দুর সঙ্গে সুস্মিতার ঠিক বনিবনা নেই।

প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যই পাল্টা আক্রমণ করলাম আমি।—লাড়ুমামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি একটু জড়িয়ে পড়েছিস আবার ?

একটু থেমে সঞ্জীব বলল—দেখ, জীবনকে যদি ইনটারেস্টিং করতে চাস তবে তুইও জড়িয়ে পড়। কিছু একটা নিয়ে জড়িয়ে না পড়লে লাইফে চার্ম কই ?

তারপর একটু থেমে একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল, কি জানিস, আমি জড়িয়ে পড়েছি। সত্যি কথাই, তার চেয়েও সত্যি এ নিয়ে আলোচনা করতে বড্ড আন্‌ইজি লাগে। কিন্তু কেন বলতো ? তোরা, মানে তুই কি মণি, তোরা জেল থেকে বেরুবি, তখন তোদের বলতে হবে, এটা যেন একটা চিন্তার মত ছিল—দুশ্চিন্তা। অশোককে কিছু বলি নি। ও খানিকটা আঁচ করে। আমি যেমন বলি নি, ও

জিজ্ঞেসও করে নি তেমনি। কিন্তু তোদের কথা মনে হয়েছে, তুই কি মণি—তোরা তো জিজ্ঞেস করবি, তখন কি বলবো ?

বয়স মানুষকে মডারেট করে। বয়স মানুষকে কনজারভেটিভও করে। কিন্তু এতই কি বয়স বেড়েছে আমাদের ?

—একেবারেই না বলার মত ব্যাপার ?

—আমার চেয়ে বয়সে বড়।

—তাইতে কি ?

—বিধবা।

—তা হোক।

—একটি ছেলে আছে।

—বেশ তো, কষ্ট করতে হলো না।

—ঠাট্টা করছিস ?

—চিনি না, জানি না এক ভদ্রমহিলা তাকে নিয়ে অমন একটা বেয়াড়া ঠাট্টা করবো কেন ?

—জড়িয়ে পড়েছি সত্যি কথা। কিন্তু কেন জড়িয়ে পড়লাম বলতে পারিস ?

—পারি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সঞ্জীব। বললাম, অঞ্জলির মধ্যে যে ক্ষুধা-বোধটা ওকে শরদিন্দুর কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ক্ষুধাটাই এ মেয়েটিকেও তোর কাছে ঠেলে এনেছে। আর তুই দেখলি, তোর অঞ্জলি ফিরে এসেছে। তোর মনের অবচেতনে অঞ্জলির যে ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে। এ সেই অঞ্জলিরই প্রতিকৃতি। সঞ্জীব বসেছিল। বসেই রইল। অনেকক্ষণ আর কোনো কথা নেই। তারপর একসময়ে উঠে পড়লাম।

—আজ চলি রে, আবার দেখা হবে।—চলে এলাম।

সঞ্জীব বলেছিল, অশোক পাল্টেছে, কেমন যেন রিজার্ভড—সঞ্জীব, সঞ্জীবও পাল্টাচ্ছে তো। এ পাল্টানোটা নিজের কাছে তেমন ধরা পড়ে না। পড়ে না বলেই সঞ্জীবও ওর পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন

নয়। সেই সঞ্জীব—কতদিন পরে দেখা। অথচ কত সহজে কত তাড়াতাড়ি ফেলে আসতে পারলাম। সঞ্জীবও চলে আসতে দিল আমায়। সঞ্জীবের বাড়ি থেকে আসতে আসতে রাস্তায় সে কথাই ভাবছিলাম।

মণিকে লিখেছিলাম, লাড়ুমামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিলেন। আমায় দেখে চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু কথা কিছুই হলো না। ট্রামটা চলে গেল·····

উত্তরে মণি লিখেছিল ঃ

জীবনের ট্রাম অমনি ছুটিয়া চলিয়াছে। শুধুই লাড়ুমামার? যে কথা যাহাকে বলিতে চাই, কোনদিন বলা হয় নাই। যে কথা কোনদিন বলিতে চাহি নাই তবুও বলিতেই হইয়াছে। সে বলার ফলাফল বারবার জীবনে বর্তাইয়াছে। বর্তাইবেও। লাইফ ইজ্ ইনটারেস্টিং—বোধহয় এইজন্যই এত ইনটারেস্টিং।—লাড়ুমামার জন্য ভাবিও না। যে কথা শুনাইতে অত আগ্রহ ছিল তাহার জন্যও নয়। ওর চেয়ে অনেক গুরুতর কথা জগতে অনেকবারই বলা হয় নাই। দুঃখ করিয়া কি হইবে? যাহা অবশ্যম্ভাবী শুধু তাহাকে বরণ করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সঞ্জীব বলেছে জড়িয়ে পড়, মণি বলেছে জড়িয়ে পড়িস না। আমি, মণি, সঞ্জীব—লোকে বলতো তিন-মাণিক।

পরিবর্তনটাই অবশ্যম্ভাবী।

একদিন মহাভারতের সঙ্গে দেখা। সেও হঠাৎ। আকাশের দিকে চেয়ে ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন।

ট্রামে যাচ্ছিলাম। নেমে পড়লাম।

জামা কাপড় জীর্ণ, চোখের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত—আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছেন।

বললাম, আপনি? এখানে?

—আপত্তি আছে?—দৃষ্টিটাকে আকাশ থেকে নামিয়ে এবারে পরিপূর্ণ তাকালেন আমার দিকে।

—তুমি কে ?

—আমি বিন্দুর বন্ধু।

—বিন্দু ? বিন্দুকে আমি চিনি না। মন্দাকিনী আমার কেউ নয়। আমিও মহাভারত নই। তুমি ভুল করেছ। আবার নিজের মনেই বলতে লাগলেন, সব ভুলতে হবে, সব ভুলতে হবে। সব নূতন করে শুরু করতে হবে।

বলে কি এ পাগল ? আশি ধরো ধরো, বলে নূতন করে শুরু করতে হবে।

—ঢাকা থেকে কবে এলেন ?

—ঢাকা ?—একটু থেমে দূরে একটা ট্রামের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—ঐ ট্রাম গাড়ি। কলকাতায় যেদিন প্রথম ট্রাম গাড়ি চললো—ঢাকা থেকে দেখতে এসেছিলাম। সঙ্গে ছিল পনেরজন ইয়ার দোস্ত—ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ। স্টিমারে গোয়ালন্দ। আবার ট্রেন, পনেরজন ইয়ার বন্ধু নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে চেপে দেখতে এসে-ছিলাম—কি ? না—কলকাতায় ট্রাম গাড়ি চলবে। সেই ট্রাম—আজও চড়েছি। চড়তেই হলো। সেদিন চেপেছিলাম সখ করে। আর আজ ?—পকেটে হাত দিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলেন কয়েক আনা পয়সা। ম্লান হেসে বললেন, ঐ সম্বল, বলতে পারো কোন লজ্জায় বলি যে আমিই মহাভারত সা। পরক্ষণেই সচকিত হয়ে আকাশে তাকালেন। আর ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখলাম দুটো ঘুড়িতে কাটাকাটির খেলা চলছে।

মহাভারত গলা খাটো করে বললেন, দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, কাটা পড়লেই, ব্যস্, দুটো দিনের জন্য নিশ্চিন্ত। বড্ড টানা-টানি চলছে কিনা ?—মহাভারত হাসলেন। ম্লান হাসি।

—দশটা টাকা দেব ? আছে আমার কাছে।

—এ্যাও—চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠলেন মহাভারত।—জানো কার সঙ্গে কথা বলছো ? জানো, বেশ্যাখাতেই আমার দৈনিক ব্যয় ছিল কতো টাকা ? জানো, আমার জয়দেবপুরের বাগানবাড়িতে শুধু

এক ঘণ্টা উলঙ্গ হয়ে ঘুড়ে বেড়াবার জন্য তুইশ বেশ্যাকে প্রত্যেককে দশ টাকা করে দিয়েছিলাম একদিন ? জানো—

কিন্তু ঘুড়িটা কাটা পড়েছিল। মহাভারত পড়ি মরি করে দৌড়ুতে লাগলেন। আর বলা হলো না। কিন্তু বলারই বা প্রয়োজন কি ? জানি তো সবই। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহাভারতের অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম। নিয়তির কি পরিহাস !

এমন কত পৌষ পরব গেছে। শ' শ' লোক অমনি দৌড়ুচ্ছে।

কেন ?—মহাভারতের ঘুড়ি কাটা পড়েছে।

তাতে কি ?—না, ঘুড়ির সঙ্গে দশ টাকার নোট বাঁধা।

মস্ত মস্ত লগির মাথায় আঠা সেঁটে, কুল গাছের কাঁটা বেঁধে পাঁচশ লোক দৌড়েছে—মহাভারতের কাটা ঘুড়ির সুতোটা যদি কোনক্রমে লুটতে পায়।

একজন নিশ্চয় পেরেছে। আর সেদিনই কি চারশ নিরানব্বুই-জনের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস মহাভারতের ভবিষ্যতে আজকের অভিশাপ-বাণী লিখে রেখেছিল ?

সেই ব্যর্থ চারশত নিরানব্বুইয়ের অভিশাপই কি আজ মহাভারতকে দৌড় করিয়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যর্থ চারশ নিরানব্বুইজন হয়ে একা মহাভারত তবে আজ কাটা ঘুড়ির মরীচিকায় দৌড়ে চলেছেন কেন ?

কিছুতেই সেই সফল একজন হওয়া সম্ভব নয় তো। কারণ এ ঘুড়ির সঙ্গে দশ টাকার নোট বাঁধা নেই।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর খেয়াল হলো, সমীরের সঙ্গে নিউ মার্কেটের সামনে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছি।

নিউ মার্কেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সমীর আসবে। সমীর কলকাতায় এসেছে, ওর সঙ্গে সময় ঠিক করেছিলাম। এ সময়ে এখানে দেখা করবে সমীর। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর ভাবছিলাম মহাভারতের কথা।—

বিন্দুসার একদিন বলেছিল—সিফিলিসের জার্ম ব্রেইনে ঢুকে গেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, এ আর ভালো হবে না। আর ভালো হয়েই বা কি হবে? আবার সেই মদ ইত্যাদি তো? তার চেয়ে এই ভালো। আমি আর ডাক্তারও দেখাই না।

তবু। মহাভারত তবু আশা করে আছেন। হোপ কুড্ নট্ কাম আউট অফ প্যাণ্ডোরাস বক্স। মানুষ আশাবাদী। উন্মাদ মহাভারত আজও আশা করে এ মেঘ আবার কেটে যাবে। আবার একদিন সব নূতন করে শুরু করবে। অপেক্ষা করছিলাম, আর ভাবছিলাম। সমীর আসছে না কেন?

আর এমনি সময়ে শরদিন্দু ডেকেছিল আমায়।

—কে, অমল না?

সারা মুখে বসন্তের গুটি—গুটি বসে যাওয়া দাগ—একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। কাঁদলে পরে কানা চোখটা গড়িয়ে জল দেয়—হাসলেও। আসলে বাঁ-চোখের অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে ওর। ও বুঝতে পারে শুধু তখনই যখন জলটা গাল বেয়ে অনেক দূর নিচে নেমে আসে।

বাঁ-হাতের চেটোয় জলটাকে লেপ্টে নিয়ে শরদিন্দু বলেছিল—কে, অমল না?

এই শরদিন্দু নাকি? চমকে উঠেছিলাম। বসন্তের অনেক গল্প আমি শুনেছি। সে শোনা। আর এ নিজের চোখে দেখলাম। একটা মানুষের চেহারা যে কোন কিছুতেই অমন বিকৃত হয়ে যেতে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

—তুমি অমল না?—ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল শরদিন্দু।

সম্বিত ফিরে এল। বললাম, হ্যাঁ, কেমন আছেন?

—কেমন আছি?—শরদিন্দু হাসলো। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ, সে হাসি কান্নারই নামান্তর।

—ভালো, ভালোই আছি তো!—হাসতে চেষ্টা করেছিল শরদিন্দু। আর তক্ষুনি ফের নেমে এসেছিল জলটা কানা চোখ বেয়ে।

—তাড়া নেই তো, চল একটা চায়ের দোকানে বসি।

হাঁটতে হাঁটতে তুজনে এসে ফেরাজিনিতে ঢুকলাম। সেই ফেরাজিনি। তুজনেই নীরব। সুস্মিতার খবর জিজ্ঞেস করবো ভেবে-ছিলাম। করি করি করেও কি এক সঙ্কোচে তবু চুপ করেই ছিলাম। অশোকরা সুনুরা বলে নি কেন? সুজু বলতে গিয়ে থেমে গেল কেন?

শরদিন্দুই শুরু করল আবার। আর অবাক বিস্ময়ে আমি শুনলাম, শরদিন্দু আমায় জিজ্ঞেস করল—সুস্মিতার খবর জানো?

তু পেয়ালা ধোঁয়াটে কফির তুপাশে কথাহীন নিঃশব্দে বসে রইলাম আমরা তুজন। আমি আর শরদিন্দু।

আমরা তুজন, যারা সেই একটি মেয়ের খবরে উৎসুক। আমরা তুজন, যারা এ ওর কাছে সে মেয়ের সংবাদের প্রত্যাশায় এইমাত্র হতাশ হওয়ার আঘাতে কথা হারিয়ে ফেলেছি।

তারপর এক সময় শরদিন্দুই শুরু করল আবার। শরদিন্দুই শেষও করল। আমি শুধু নীরবে শুনে গেলাম। কখনো থেমে, কখনো কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, কখনো গলার শ্লেষ্মা ঝেড়ে শরদিন্দু বলে গেল—বসন্ত তো শুধু একটা চোখ কানা করেই থেমে থাকে নি, মুখময় গুটি গুটি চিহ্ন এঁকেও নয়। বসন্ত আঘাত করেছে আমার পুরুষত্বেও।

বছর দেড়ক আগে বসন্ত হয় আমার। সুস্মিতা ছিল, এখানেই। ও ভয় পেয়েছিল। তাই ডাক্তার নার্স সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজে পালিয়ে গেল দিল্লী। মিঃ সেন তার আগে থেকেই দিল্লীতে পোস্টেড ছিলেন।

বসন্ত সারল—রেখে গেল তার চিহ্ন আমার মুখে, আমার চোখে, আমার পুরুষ-অঙ্গে।

এতদিন নার্সের সঙ্গেই চলতো ওর চিঠি পত্রের আদান-প্রদান। আমি সেরে ওঠার পর আমায় লিখল দিল্লী বেড়িয়ে আসতে।

আমি জবাব দিই নি সে চিঠির।

একথাটা ততদিনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে যে সুস্মিতাকে আমি জয় করতে পারি নি। ওকে আমি বিয়ে করেছি, ওকে আমি ভোগ করেছি—কিন্তু সে অন্য জিনিস। জয় করা নয়।

যখন আমি বসন্তে মর মর—ওর দায়িত্ব নার্স-ডেকে দেওয়া। সেতো দায়িত্ব। কিন্তু আরো যেন কিছু চাই। এ দুর্বলতা আমার কোন কালে ছিল না। আগে কোনদিন মনেও হয় নি। কিন্তু অসুখে পড়ার পর থেকে, সেরে ওঠার পরেও এ চিন্তাটাই বড় পীড়া দিয়েছে আমাকে। এই দেড় বছর তাড়া করে করে ফিরেছে আমার পেছন পেছন।

আজ আর কোন রাস্তা নেই। আজ আর সুস্মিতাকে জয় করা যাবে না। আমার এই বিকৃত চেহারা, এই কানা চোখ, তারও পরে যখন সুস্মিতা জানবে আমি—সেদিন আমায় চিরদিনের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওর মন থেকে। অসহ্য—এ চিন্তা অসহ্য। তাই ঠিক করে ফেললাম। ঠিক করে ফেললাম······

চিঠি,—

চিঠি,—

চিঠি,—

তার।

আমি নিরুত্তর।

তারপর সুস্মিতা নিজেই এসে হাজির হলো। আর দরজায় আগল এঁটে বসে রইলাম আমি।

—দরজা খোলো।

আমি নীরব।—দরজা খোলো।—আমি নিরুত্তর।

—একি রসিকতা, দরজা খোলো।—

সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যেতে লাগলাম।

—তুমি তো রয়েছ। সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি তো আমি।—

আরো একটা সিগারেট ধরালাম।

তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল সুস্মিতা।—ওগো দরজা খোলো।—

খুলতেই যাচ্ছিলাম। আমিও তো মানুষ। কিন্তু তক্ষুনি সামনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আমিই চমকে উঠলাম! যেন এক চক্ষুর শাসনটা ধমকে উঠলো নিঃশব্দে। আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দরজায় ধাক্কা পড়ল এবারে। খোলো, খোলো দরজা, লাথি পড়ল দুর্বল পায়ের—সে তো দরজায় নয়, যেন আমার মনে।

শরদিন্দু বলল,তবু খুলি নি।

দেড় বছর হয়ে গেল। সেই থেকে সুস্মিতার খবর জানি না। সুস্মিতার একটা ফেলে যাওয়া হাতব্যাগে সেদিন পেলাম একটা চিঠি। সে চিঠি বেশ কবছর আগেকার। সুস্মিতাকে লেখা, তোমার চিঠি। চিঠিটা আমি পড়েছি।

তাই মনে হয়েছিল হয়ত তুমি জানলেও জানতে পারো ওর খবর। একটা নিরাপদ আশ্রয়—মেয়েরা তাই চায় তো। ওর পরম প্রয়োজনের দিনে সে পত্রে তুমি ওকে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।

অনেকক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, শুনেছি কলকাতায় নেই। দিল্লীও নয়। কোন একটা গ্রামে, কোথায় জানি না, কোন স্কুলে মাষ্টারী নিয়ে চলে গেছে।

—চলি তবে।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমাকেও যেতে হবে। গ্রামে গ্রামে। না সুস্মিতার খোঁজে নয়। মাষ্টারী করতেও না। এবারে আর ভুল নয়।

ওপর-তলা থেকে যেন টেনে তুলছি এ মন নিয়ে আর নয়। এই মন পাল্টাতে হবে।

রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ওদের সঙ্গে সমান তালে রোয়া রুইতে

হবে। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে—দিনে, রাতে ওদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হবে। মুষ্টিমেয় আমরা কজনা মাত্র আর নয়। এবারের সংগ্রাম যেন ওদের সংগ্রাম হয়।

লাখো লাখো উন্মত্ত হিংস্র জনতার সংগ্রাম।

আর তারও আগে—তারও আগেই যেন আমিও ওদের একজন হয়ে যেতে পারি। দেরি করার সময় কই ?

শরদিন্দু, সুস্মিতাদের পেছনে রেখে ফেরাজিনি থেকে বেরিয়ে এলাম।